ফতেপুর সিক্রি

আগ্রা থেকে বাসে চড়ে ফতেপুর সিক্রি রওনা হলুম। আগ্রা থেকে এর দূরত্ব চব্বিশ মাইল। প্রতি ঘণ্টায় বাস ছাড়ে। ভাড়াও মাত্র তের আনা। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া অবশ্য এর দেড় গুণ। আগ্রার বাসের ব্যবস্থা ভাল। সরকারী পরিচালনাধীন। কিউ করে টিকিট ঘর থেকে টিকিট কিনে বাসে চড়তে হয়। অনেকটা রেলের মত ব্যবস্থা। বাস অনেক জায়গায় থেমে থেমে চলে, তাই এই চব্বিশ মাইল পথ যেতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। ফতেপুর সিক্রিতে রেল পথে যাবার ব্যবস্থাও আছে।

আগ্রা এসে ফতেপুর সিক্রি না দেখে গেলে অনেক দেখাই বাদ থেকে যায়। মোগল বাদশা আকবর এখানেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রাজধানী স্থাপনার সময় এ স্থান হয়ত জন কোলাহলময় ছিল, কিন্তু এখন আর তার কোন জৌলুব নেই। জনসংখ্যাও খুব কম। প্রাচীন কীর্তি হিসাবে বিরাট এই রাজপ্রাসাদ সংরক্ষিত হচ্ছে।

সমস্ত প্রাসাদ গুলিই লাল পাথরের। আকবরের সময় থেকেই অনেক কাল কেটে গেছে, কিন্তু এখনও পাথরগুলি অটুট আছে ও সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। পাথরগুলি মূল্যবান। সাধারণ লাল পাথর নয়। অনেক স্তম্ভই সুচারু সূক্ষ্মকার্যে সুশোভিত।

ফতেপুর সিক্রীতে ভ্রমনার্থী দলের বেশ সমাগম হয়। প্রাসাদ দেখবার জন্য গাইডও পাওয়া যায়। ভাল গাইড না নিলে অনেক আবোল তাবোল শুনতে হয়। ইতিহাসের সঙ্গে সেসব উক্তির সামঞ্জস্য খুজে পাওয়া যায় না। দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রচুর তাই গাইডের সংখ্যাও বিরল নয়।

গাইডের সঙ্গে প্রথম যে ঘরটায় এসে পড়লুম, এক সময় সম্রাট এসে জনগণকে দর্শন দিতেন। পরবর্তী কালে রেকর্ড রুম হিসাবেও সেটা ব্যবহৃত হত।

ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদ অনেকটা উচ্চ স্থানে স্থাপিত। ছোট একটা টিলার উপরে প্রাসাদ তৈরী করা হয়েছে। পাহাড় বেয়ে উঠবার মত খানিকটা রাস্তা অতিক্রম করে প্রাসাদে পৌছানো যায়। বাস এসে থামে টিলার নীচে। অবশ্য সেখান থেকে পায়ে হাঁটার একটা খাড়া পথও আছে।

পাঁচমহল দেখলুম। লাল পাথরের পাচতলা প্রাসাদ। প্রত্যেকটীতেই বসবার জায়গা রয়েছে। এখান থেকে বহুদুর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হয়। বাইরের দৃশ্যগুলিও মনোরম হয়ে চোখের সামনে ধরা পড়ে। ঘরগুলির সৌষ্ঠবও অনবদ্য। নির্মাণে একটা শিল্পীমনের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। দূর থেকে এই সুউচ্চ পাচমহলের দৃশ্যও অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

দেওয়ানই আম দেখলুম। এটা সম্রাটের বাইরের দরবার। এই দরবারে সম্রাট আকবর প্রজাদের আবেদন গ্রহণ করতেন। বড় বড় স্তম্ভের সাহায্যে তৈরী করা হয়েছে এই দরবার হল। এর মাঝে বসতেন সম্রাট একটা উচ্চস্থানে। লাল কেল্লার মতই এ আসনের ব্যবস্থা।

দেওয়ান-ই-খাস সম্রাটের খাস দরবার। এখানে আমীর ওমরাহ আর সম্রাটের প্রীতিভাজন লোকেরাই তাঁর সাক্ষাৎ পেত। তাদের গোপন দরবারও বসত। দেওয়ান-ই-খাস সুশোভিত ও মূল্যবান প্রস্তরে গঠিত। কারু সজ্জা ও জাঁক-জমকের জন্য দেওয়ান-ই-খাস বিখ্যাত। মোগল বাদশাহরা তাঁদের সময় দরবারকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলবার কোন ত্রুটি রাখেননি।

রাণী যোধাবাইএর মহলটী দেখবার জিনিস। যোধাবাই ছিলেন রাজা মানসিংহের ভগিনী, আকবরেব প্রধানা মহিষী। মোগল বাদশাহকে বিবাহ করা সত্বেও তিনি অনেক হিন্দু ধর্মের নীতি মেনে চলতেন।

যোধাবাই মহলে অনেকগুলি ঘর আছে, সবগুলিই সুন্দর কারু-কার্য্য পূর্ণ। এ ছাড়া এই মহলে একটী মন্দিরও আছে। গাইড জানাল, এখানে বেগম যোধাবাই পূজো করতেন হিন্দুমতে। সম্রাট আকবর ধর্মমতে উদার ছিলেন। তাই তিনি এতে কোন বাধা দেন নাই।

ফতেপুর সিক্রির অশ্বশালাটীও দেখবার জিনিষ। অনেকগুলো তেজী ঘোড়া থাকত এখানে। প্রাসাদের অভ্যন্তরেই এই অশ্বশালা। অশ্বদের বহির্গমনের পথটীও সুন্দর।

প্রাসাদ সংলগ্ন 'একটী নাতি দীর্ঘ স্তম্ভ আছে। একে বলা হয় এলিফ্যাণ্ট টাওয়ার। গাইড জানাল, সম্রাটের প্রিয় হস্তীর স্মৃতি রক্ষার জন্য এই স্তম্ভ রচিত হয়েছিল।

সিক্রির প্রাসাদ সংলগ্ন বীরবলের প্রাসাদটীও সুন্দর। বীরবল সম্রাটের নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন। সম্রাটকে সুখী রাখবার চেষ্টায় তাকে সব সময় হাস্যরস পরিবেশন করতে হত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও হাস্যরসিক ছিলেন তিনি। সম্রাট আকবর সর্ব ধর্ম সমন্বয় করে

"দীন ইলাহী" ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সম্রাটের হিন্দু সভা-সদস্যদের মধ্যে ইনিই কেবলমাত্র সে ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর বাসগৃহটী দোতলা এবং দেখতেও সুন্দর। বীরবলের মেয়েদের থাকবার জন্য সম্রাট এই বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন।

এ ছাড়া রয়েছে আবুল ফজল ও ফৈজীর বাসস্থান। আবুল ফজল সম্রাট আকবরের জীবন চরিত "আকবর নামা" লিখেছিলেন। সেটা পড়লে সম্রাটের শাসন প্রণালী ও সেই সময়ে দেশের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এদের প্রাসাদ দুটী সাধারণ ভাবে গড়া। রাজা মানসিংহ ও রাজস্ব সচিব তোডরমল্লের বাসস্থান ছিল প্রাসাদের বাইরে।

এ ছাড়া আরও অনেক ঘর আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবুতর ঘর, হাকিমের বাসস্থান, খোয়াবাগ. আঁখমিচেলে, বেগমদের ঘর ইত্যাদি। সবগুলিই লাল পাথরের তৈরী এবং সুন্দরভাবে নির্মিত।

সম্রাট আকবরের ধর্ম গুরু ছিলেন হজরৎ শলিমউদ্দিন চিশতি। এখানে তাঁর কবর আছে। বিরাট এক প্রাসাদে তার কবরটী রক্ষিত। ষোড়শ শতাব্দীতে এই সমাধি গৃহটী নির্মিত হয়। গৃহটী মার্বেল পাথরের তৈরী এবং দেখতেও খুব সুন্দর। আগাগোড়া নানা কারু শিল্পে সুশোভিত, দেওয়ালে সুন্দর ঝিনুকের কাজ। সমাধি গৃহটীর অভ্যন্তরে চারিদিক প্রদক্ষিণ করে দেখলুম মার্বেল পাথরের উপর সুন্দর ঝিনুকের কাজের বিন্যাশ। দীর্ঘকালের ব্যবধান সত্তেও তার দীপ্তি এতটুকুর জন্যও ম্লন হয়নি। সামনে লাল পাথরের বুলান্দ দরজা। মাঝের এই মার্বেল পাথরের সমাধি গৃহটী দেখলে মনে হয় বিরাট এক লাল ঝিনুকের মধ্যে ছোট একটী মুক্তা বিশেষ শোভা পাচ্ছে।

সমাধি গৃহটীর সামনের বুলান্দ দরজাটী দেখবার জিনিস। এমন

উঁচু দরজা কদাচিৎ দেখা যায়। লাল পাথরের এই সুউচ্চ দরজাটী দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিরাট এই প্রাসাদ। অসংখ্য এর গৃহ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। মিশ্র ক্রমাগত তাড়া দিয়ে নিয়ে চলেছে। এর কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না অথচ দেখবার জন্যও বেশী সময় নেওয়া চলবে না। আমাদের মধ্যে বাপাইয়া ক্লান্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। প্রায়ই তাকে পিছনে পড়ে থাকৃতে হয়েছিল। মিশ্র তাড়া লাগাতে ম্লান হাসি হেসে জানাল, মিশ্র দৌড়ায় ঘোড়ার মত, আর জল খেতে পারে মাছের মত। ও দুটোর কোনটাই আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

মিশ্রজী মানল না। তাকে টেনে নিয়ে চলল, অবশেষে সবটা দেখিয়ে বাসের পাশে এসে হাজির হল। মোটর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

গাইডকে বিদায় করল মিশ্র মাত্র আট আনা পয়সা দিয়ে। গাইড প্রবল আপত্তি জানাতে মিশ্র অনর্গল হিন্দী ভাষায় যে উক্তি করল তার মর্মার্থ এই, গাইডের কোন দরকার নেই বলা সত্বেও তুমি আমাদের পিছু নিতে কসুর কর নি, জিজ্ঞেস করেও তোমার কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। নিজে জান না কিছুই। সব জিনিস ভাল করে শিখে নিয়ে গাইডের কাজ করো। গাইডের কাজ তোমাকে ছাড়াও চলতো। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে একটা পদার্থ আছে, সেটা একটু নাড়াচাড়া করে দেখো!

অকাট্য যুক্তি। গাইড অগত্যা অপ্রসন্ন মনে আট আনা নিয়েই চলে গেল। প্রথমে এর দাবী ছিল তিন টাকা।

বাস থেকে উর্ধে প্রাসাদের দিকে চেয়ে রইলুম। সূর্য কিরণ লাল পাথরের উপর পতিত হয়ে একটা সুন্দর রক্তিমাভা বিচ্ছুরণ করছে।

দূরে প্রাসাদের ভগ্ন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটা রেল গাড়ি সশব্দে চলে যাচ্ছে। প্রাসাদ পরিখার অভ্যন্তরে হয়েছে গমের চাষ।

ফতেপুর সিক্রি। লাল পাথরের প্রাসাদের ঐশ্বর্যভরা, নীরব, নির্জন, প্রেতপুরীর মত নিস্তব্ধ। অথচ একদিন ছিল জনকোলাহলে পরিপূর্ণ, দীপাবলী শোভিত। সারা ভারত চেয়ে থাকত। আজ আর সে সম্রাটও নেই, রাজধানীও নেই। চারিদিকে বিরাজ করছে গভীর নিস্তব্ধতা। কালের গতি এমনিভাবেই চলে। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। কি দম্ভপূর্ণ উক্তি! মানুষ পার্থিব ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে উঠে, পার্থিব ঐশ্বর্যে বলীয়ান হয়ে আপন সীমার কথা ভুলে যায়। ভাবে আমিই সব, সবই আমি। মহাকাল হাসেন।

বাস ছেড়ে দিল। লাল পাথরের প্রাসাদগুলো চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, আশেপাশের ভগ্ন গৃহের স্তূপ, সেনানিবাসের ধ্বংসাবশেষ ও ভগ্ন প্রাকারে এসে শেষ পরিচয় জানিয়ে দিল।

বিশ্বকবির একটা কবিতার চরণ মনে এল,—

"চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ—
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে—

আগ্রা

বাসে এসে পৌঁছলুম আগ্রা সহরে। সহরটা বেশ বড়। রেল স্টেশন আছে তিনটি—আগ্রা সিটি, আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট ও রাজমণ্ডি। অনেক বড় বড় হোটেল আছে। প্রতি বছর সারা পৃথিবী থেকে দর্শনার্থী আসে এখানে।

সহরটা পুরাণো, নতুন গৃহও অনেক নির্মাণ করা হয়েছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে বহু বাস্তুত্যাগী এসে বাস করছে এখানে। স্থানীয় মুসলমানের সংখ্যাও প্রচুর।

মথুরা থেকে বাসে সেকেন্দ্রা পথের মধ্যে পড়ে। আগ্রা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর এর নির্মাতা। এখানে সম্রাট আকবরের সমাধি আছে। এর নির্মাণ-কার্য শেষ হতে লেগেছে চৌদ্দ বছর। সমাধি গৃহটির মার্বেল পাথরের মেঝের আয়তনই চার শ' বর্গফুট। সেকেন্দ্রার ঠিক মাঝখানেই সমাধিগৃহ। ঘরটা পাঁচতলা। সেকেন্দ্রার এই সমাধিগৃহটি বৃহৎ প্রাচীরবেষ্টিত। দূর থেকে মনে হয় একটা দুর্গ। প্রাচীরের চারিদিকে দরজা রয়েছে।

সেকেন্দ্রার এই গৃহ নির্মাণ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেই আরম্ভ হয়। গৃহ নির্মাণে মোট ব্যয় হয় পনের লক্ষ টাকা। সেকেন্দ্রার গেট চিত্তাকর্ষক, নানা কারুকার্যে ভরা।

আগ্রা দুর্গটি নির্মাণ আরম্ভ করান সম্রাট আকবর ১৫৩৬ সালে। পরবর্তী কালে সম্রাট শাহজাহান এর নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

আগ্রার দুর্গটি আগ্রা সহর সংলগ্ন। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই। একটা চায়ের দোকানে বিছানাপত্র জমা রেখে মিশ্র দুর্গ দেখতে আমাদের হেঁটেই নিয়ে চলল। সামনেই আগ্রা দুর্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রামারাও একটা টাঙ্গা করবার জন্য বার বার তাগাদা শুরু করল। কিন্তু মিশ্র নির্বিকার। বাপাইয়া আমাদের সঙ্গে ক্লান্ত পদে চলতে লাগল। মিশ্র কোন কথা কানে তুলবে না। কঠিন নেতা নির্বাচন করেছি আমরা।

দুই আনা দিয়ে টিকিট কেটে আগ্রা দুর্গে ঢুকে পড়লুম। যমুনা নদীর পাশেই এই দুর্গ। দুর্গমূলে একটি পরিখা আছে। পরিখা পারাপারের সেতুটি দুর্গদ্বারে স্থাপিত। গেট পার হয়ে খানিকটা চড়াই ভেঙে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রাসাদমূলে পৌঁছলুম। প্রাসাদগুলো অতি চমৎকার। এর অধিকাংশই মার্বেল পাথরের তৈরি এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়।

দেওয়ান-ই-আম দেখলুম। সম্রাটের সাধারণ দরবার। সম্রাট শাহজাহান এটি ১৬৩৫ সালে নির্মাণ করেন। লাল পাথরের তৈরি এই দরবার গৃহ। স্তম্ভ ও ছাদ সাদা রং করা। মাঝখানে সম্রাটেব বসবার জন্য সিংহাসন কক্ষ। দরবার হলটি ১৯২ ফুট লম্বা ও ৬৭ ফুট চওড়া।

দেওয়ান-ই-খাস গৃহটিও চমৎকার। রাজকার্যে আমীর ওমরাহ নিয়ে সম্রাট এখানে বসতেন। সম্রাট আকবর এটা ১৫৬৬ সালে নির্মাণ করেছিলেন। তখনও সব কাজ সারা হয় নি। শেষ করেন

সম্রাট শাহজাহান। হলটি দৈর্ঘে ৫০০ ও প্রস্থে ৩৭০ ফুট। লাল বালু পাথরে হলটি তৈরি।

আগ্রা দুর্গের অন্তঃপুরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন সম্রাট আকবর ও শেষ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। মহলটিকে জাহাঙ্গীর মহল বলা হয়। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ভেতরের আয়তন ৭৬০ বর্গ ফুট। চারিদিকেই দোতলা দালান। এর উত্তরে যোধাবাঈএর মহল ও পশ্চিমে তার মন্দির। দক্ষিণে বসবার জায়গা।

খাস মহলটি নির্মাণ করেন সম্রাট আকবর। হারেমে বেগমদের থাকবার জন্য গৃহ। এখান থেকে তাজমহলের দৃশ্য সুন্দর ভাবে দেখা যায়। সম্রাট শাহজাহান এর অনেক উন্নতি বিধান করেন। মাঝখানে একটা বড় হল। এর দৈর্ঘ ৮৮ ফুট ও প্রস্থ ৬২ ফুট। সামনে একধা কৃত্রিম পুকুর। এখান থেকে অঙ্গোরীবাগের চৌবাচ্চায় জল নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এটাও দেখবার জিনিস।

সমন বুরুজটিই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর। অদ্ভুতভাবেই এই ঘরটা নির্মিত হয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় ঘরটা দোতলা, কিন্তু আদৌ তা নয়। চারিদিকে গ্যালারী থাকার ফলেই এই দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। মাঝখানে একটা স্তম্ভের উপরে চারিদিক দিয়ে মধ্যে যাবার রাস্তা রয়েছে। মন্ত্রীদের নিয়ে বাদশাহ এখানে বসতেন। সম্রাট বসতেন মাঝখানে, স্তম্ভটার ঠিক উপরে। রাস্তার মুখে বসতেন মন্ত্রীরা। হয়ত এটা এবাদৎখানার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে গঠন করা হয়েছে। এবাদৎখানায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীরা একত্রিত হয়ে ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনা করে থাকেন।

আগ্রা দুর্গের মধ্যে দুটি মসজিদ আছে। দুটিই মার্বেল পাথরের তৈরি। খাস মহলের মধ্যের মসজিদটি ছোট। বাদশাহ ও বেগমরা

এখানে নমাজ পড়তেন। বাইরের মসজিদকে বলা হয় মতি মসজিদ। মার্বেল পাথরের তৈরি বিরাট মসজিদ এটি। দরজাগুলোও খুব উঁচু। ভিতরের কারুকার্যগুলিও সুন্দর। ছাদ, স্তম্ভ, দেওয়াল সবগুলোর দিকেই বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার ইচ্ছা হয়। সূর্যকিরণ মার্বেল পাথরের উপর প্রতিফলিত হলে ঝলমল করে উঠে। মেঝটিও মূল্যবান মার্বেল পাথরের তৈরি।

এই আগ্রা দুর্গে-ই সম্রাট শাহজাহান আমরণ বন্দী জীবন যাপন করেন। সম্রাট-কন্যা জাহানারা তাঁর পরিচর্যার ভার নিয়েছিলেন। দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পিতার পরিচর্যা করেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার করবার সময় সব ভাইকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু এই বোনটিকেই পিতার পরিচর্যার ভারার্পণে সম্মত হয়েছিলেন।

সম্রাট যে ঘরে বাস করতেন সেটা দেখলুম। ঘরটি মার্বেল পাথরের তৈরি, তবে আয়তনে ছোট। আগ্রা দুর্গের মধ্যে এইটিই সব চেয়ে ভাল ঘর। মার্বেল পাথরে নানা কারুকার্যখচিত। শিল্পীদের সূক্ষ্ম কার্যে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। যমুনার দিকে একটা ছোট বারান্দা আছে। এই বারান্দা থেকে তাজমহলের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। বারান্দার এককোণে আছে ছোট একটি রঙীন কাঁচ; আয়তনে এক ইঞ্চিরও কম। এই কাচের ভিতর দিয়ে তাজমহলকে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

বন্দী অবস্থায় সম্রাট শাহজাহান নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকতেন তাজমহলের দিকে। প্রাসাদের গা-বেয়ে যেত যমুনার জল। অন্তরের ব্যথা তিনি অন্তরেই চেপে রাখতেন। দীর্ঘ অশ্রু জলের পরিসমাপ্তি

ঘটল একদিন। জাহানারার সেবা-পরিচর্যা আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

আগ্রা দুর্গ-টি খুব বড়। চারিদিকে বিরাট পাথরের প্রাচীর। প্রাচীরের অভ্যন্তরেও আর একটা প্রাচীর। প্রাচীরের উপর দিয়ে চলাফেরা করবার রাস্তা আছে। দুর্গ-টিকে সুদৃঢ় করবার প্রচেষ্টা কম হয় নি। তখনকার দিনে এঅঞ্চলে যুদ্ধ হতো স্থলে, কাজেই দুর্গ সুদৃঢ় করবার প্রয়োজন ছিল।

লালকেল্লা, ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা দুর্গ; তিনটিই বড় দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ সমন্বিত। এর এক একটা এক এক ভাবে তৈরি। যদিও মূলগত একটা সাদৃশ্য তিনটিতেই আছে। আগ্রা দুর্গ-টির রচনায় সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে কসুর করা হয় নি। সম্রাট শাহজাহান ছিলেন শিল্পপ্রিয় সৌন্দর্যসেবী। তাই দুর্গ-টিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে গড়ে তোলবার জন্য তিনি কার্পণ্য করেন নি।

এর বেগম মহল, খাস দরবার, সম্রাটের থাকবার ঘর, বসবার ঘর প্রত্যেকটিই সুন্দরভাবে রচিত হয়েছে। মার্বেল পাথরের কাজই বেশী। কোন কোনটা সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের, কোনটা আবার মার্বেল পাথরের অনুকরণে রচিত। মীনা করা কাজ অনেক ছোট ছোট পাথর বসিয়েও ঘরগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দুর্গ-টির নির্মাতা ছিলেন তিন জন সম্রাট। আকবর যা রচনা করেছিলেন, জাহাঙ্গীর সেগুলোকে আরও ভাল করে তোলেন। শেষটায় সম্রাট শাহাজাহান শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে এটাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলেন। সুতরাং তিন পুরুষের এই দুর্গ-টি শুধু মাত্র মনোরমই

হয় নি, পরন্তু এর নির্মাণ কার্যে অর্থব্যয়ও হয়েছে যথেষ্ট। আশ্চর্যের বিষয় যে, দুর্গ-টি মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন শাহাজাহান। দুর্ভাগ্যের ফলে সেই দুর্গে-ই আমরণ বন্দী জীবন যাপন করতে হল তাঁকে। শুধু মাত্র সান্ত্বনা ছিল, কন্যা জাহানারার সেবা—মরুভূমির ওয়েসিসের মত।

মিশ্র তাড়া লাগাতে লাগল। রাওযুগল তাতে সায় দিতে আরম্ভ করল। বাপাইয়া লনের মধ্যে বসে পড়েছিল। তাকে তুলে নিয়ে আগ্রা দুর্গ থেকে বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লুম।

মিশ্র আমাদের টেনে নিয়ে গেল একটা চায়ের দোকানে। দীর্ঘ পরিশ্রমে শরীর ও মন ক্লান্ত। এক কাপ চা পান করে শরীর ও মন সতেজ রাখা দরকার। আগ্রা ফোর্টের মধ্যেই চায়ের দোকান। এক প্লেট ডালমুট চিবোতে চিবোতে চায়ের সদ্ব্যবহারে লেগে গেলুম।

ফোর্ট থেকে বের হয়ে একটা টাঙ্গা ভাড়া করে আমরা যমুনার অপর পারে ইতিমোদ্দৌলার কবরখানা দেখতে গেলুম। যমুনা নদী পারাপারের জন্য সেতু আছে। সেতুটি অদ্ভুতভাবে তৈরী, দোতালা সেতু। উপরে রেলগাড়ী হু হু শব্দে চলে যায়; নীচে মানুষ ও গাড়ী যাবার পীচের রাস্তা। দুটো তলাই সেতুর উপরে সুদৃঢ় লোহার ফ্রেমে আঁটা। যাতায়াতের ব্যবস্থা এক মুখী। দু' খানা গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে না। অপর দিক থেকে মোটর গাড়ী টাঙ্গা প্রভৃতি আসছে। এদিকে জ্বালানো রয়েছে লাল বাতি। কাজেই অপেক্ষা করতে হল। ইতিমধ্যে একটা মালগাড়ী উপরের রেলপথ দিয়ে হুস্ হুস্ করে চলে গেল। মাথার উপর দিয়ে তার গমন পথ। দেখতে বেশ লাগল।

যমুনার সেতুটি আকারে বেশ বড়। টাঙ্গায় চড়ে নদীর দৃশ্য

দেখতে দেখতে অগ্রসর হলুম। নদীর দু'ধারেই সহর। তবে অপর পারের সহরটি আয়তনে ছোট, সুবারবণ বলা চলতে পারে। সেতু পার হয়ে অল্প একটু দূরেই ইতিমোদ্দৌলার কবরখানা।

আগ্রায় এটা বিশেষ দর্শনীয় জিনিস। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বাবা ও মার কবর আছে এখানে। পার্শী ভাষায় একে বলা হয় "মকবরা ইতিমোদ্দৌলা"। নূরজাহানের বাবার নাম ছিল গিয়াসুদ্দিন। কাশ্মীর যাবার পথে কাঙ্গরা উপত্যকায় ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে এর মৃত্যু হয়। ঐ বছরই এই কবরখানা নির্মিত হয়। গিয়াসুদ্দিন ও তার পত্নীর কবর পাশাপাশি স্থাপিত। কবরের উপরে হলদে পাথর ও মার্বেলের কাজ। আশেপাশের ঘরে গিয়াসুদ্দিনের আত্মীয়-স্বজনের কবর। কবরখানাটি নানা কারুকার্য মণ্ডিত। আগ্রা ফোর্টের জানালার অনুরূপ জানালাও এখানে আছে। গৃহের বর্হিভাগেও নানা কারুকার্য। ছোট বড় নানা রকম রঙ্গীন পাথর বসিয়ে ঘরটার শোভা বর্ধন করা হয়েছে। আগ্রা ফোর্টেও পাথর বসানো কারুকার্য আছে, কিন্তু এখানকার কারুকার্য আরও সুন্দর। ও সুরুচি সম্পন্ন। কারুকার্যটির ক্ষেত্রও ব্যাপক। ঘরে বাইরের সব স্থানই কারুকার্য বোঝাই। চারিদিকে উচ্চ মিনার। এর উপরেও উঠা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল; কাজেই হ্যারিকেনের সাহায্য নিয়ে কারুকার্যের পরিচিতি নিতে হল। নানা রকম পাথর বসানো লতাপাতার কাজ বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করে। ভেতরে বাইরে চারিদিক ঘুরে দেখতে লাগলুম। মেঝেটিও দেখলুম নানা রঙীন কাজে ভরা। মার্বেল পাথরের এই সুদৃশ্য কবরখানাটিতে রঙীন পাথর বসিয়ে সুষমা শোভিত করবার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি রাখা হয় নি। এটা না দেখে গেলে, অনেক দেখাই বাকি থাকত।

ফেরবার পথে একটা মার্বেল পাথরের দোকানে ঢুকে ছোট-খাট দু'চারটে জিনিস কিনে নিলুম। আগ্রায় মার্বেল পাথরের নানা রকম টুকিটাকি জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।

আগ্রায় অনেক পুরানো মসজিদ আছে। কোন কোনটি দেখতে বেশ ভাল। সবগুলিই এক ধাঁচে গড়া, মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন।

তাজমহল

তাজমহলকে বলা হয় মার্বেলের স্বপ্ন! বিশ্বকবির ভাষায় বলতে হয়,—"কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল।"

সত্যই তাই। তাজমহল যে কি, সেটা একবার না দেখলে, অন্তর দিয়ে অনুভব না করলে, ভালভাবে বোঝা যায় না। এ তো শুধু মার্বেল পাথরের একটা ঘর নয়, মানুষে গড়া সৌন্দর্যের অনুপম সৃষ্টি।

বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে এটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ত্রিশ বছর পরে এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়। তখনকার সময়ে দশ কোটি টাকা ব্যয় হয় এই গৃহ নির্মাণে। এ ছাড়া কোটি টাকার পাথর ও রত্নাদি ছিল এখানে।

সামনের ঝিলটির দৈর্ঘ ৪৩ ফুট। পাঁচটি ফোয়ারা আছে তাতে। সাধারণতঃ রবিবারে ফোয়ারাগুলি খুলে দেওয়া হয়। সব সময়ে এই ঝিলটি জলে ভরে রাখা হয়। মাঝখানে তাজমহলের প্রতিবিম্ব দেখবার

জন্য একটা বেদী। এর আয়তন ৭৪ বর্গফুট। সামনের বাগানটির আয়তন ৯৭১০ ফুট।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে সামনে পড়ে আটকোণা মার্বেলের ঘর। মমতাজ ও শাহজাহানের কবর রয়েছে মাঝখানে। ১৬২৯ সালে মমতাজ মারা যান। এর দশ বছর পরে সম্রাট শাহজাহান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ইতিকথা।

একটা টাঙ্গায় চেপে তাজমহলে উপস্থিত হলুম। আগ্রা ফোর্ট থেকে এর দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী। গেটের সামনে রয়েছে কয়েকটা দোকান। মার্বেল পাথরের অনেক জিনিস সেখানে কিনতে পাওয়া যায়।

গেটটা উঁচু, দেওয়ালের মত। তাজমহল দেখতে কোন দর্শনী লাগে না। সবাই এটা নির্বিবাদে দেখতে পারে। গেট পার হয়ে ভেতরে গেলুম। সামনে পড়ল প্লাটফরম, সেটা ডিঙ্গিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এলেই একটা ঝিল। তার তু' পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা। ওরই একটা পথ দিয়ে এগিয়ে গেলুম।

রাঘবেন্দ্র রাও বললে, বাবার কাছে শুনেছি, তাজমহলকে তৈরি করা হয়েছে ঠিক যেন কাঁচি দিয়ে কেটে, এতটুকু ত্রুটি নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখবার খুব ইচ্ছা ছিল। আজ সেটা সার্থক হলো।

বাপাইয়া বললে, তাজমহল দেখে গেছি বিশ বছর আগে, দেখে আশা মেটে নি। তাই আবার দেখবার সুযোগ পেয়ে ছুটে এসেছি।

রামা রাও ও মিশ্র নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাজমহলের দিকে। আমিও ভাবতে লাগলুম আমার কথা। কাব্যে, রচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যে কতবার তাজ আমার কাছে এসে ধরা

দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। যাঁরা দেখে গেছেন, তাঁদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনাও বার বার কানে ভেসে আসছে। মনের মধ্যে তাজকে কেন্দ্র করে এক অপূর্ব কল্পনা গড়ে উঠেছে। আজ তারই বাস্তব পরিচিতি নিতে যাচ্ছি। বাস্তব ও কল্পনায় যে পার্থক্যটুকু ব্যাপক হয়ে ধরা দেয়, সেটা আমার মনে এসে আজ কি রূপ নেবে? দুটোর সামঞ্জস্য বিধান কি হবে আজকের এই সুস্পষ্ট পরিচিতিতে!

তাজকে বলা হয় পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। পৃথিবী ঘোরার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কাজেই অন্য আশ্চর্য জিনিসগুলি কি তার বর্ণনা গ্রন্থ পাঠের মধ্যেই জেনেছি। আজ যে আশ্চর্য বস্তু চোখের সামনে এসে ধরা দেবে, তার ভিতর যদি অভিনবত্ব কিছু ধরা না পড়ে, তাহলে মনটায় যে ক্ষুব্ধতা দেখা দেবে, তা থেকে রক্ষা পাব কি করে? বিশ্বকবি তাজের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন,—"এক বিন্দু নয়নের জল"। একি শুধু অন্তরের জিনিস, বাইরের কিছু নয়? কোটি কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ে, হাজার হাজার লোকের শ্রমদানে যে মর্মর-সৌধটি গড়ে উঠেছে, সেটি কি অন্তর বাহির দুটোকেই আপ্লুত করে দেবে না? শশঙ্কিত মন নিয়ে দূর থেকে তাজের দিকে চেয়ে রইলুম।

শুভ্র সমুজ্জ্বল তাজ। অপরাহ্ণের স্তিমিত সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হচ্ছে, অপূর্ব, অদ্ভুত এ দৃশ্যে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলুম। একি অপরূপ সৌন্দর্য! যুগ যুগ ধরে সমভাবেই মানুষের মনে আনন্দ বিকীরণ করছে। কবির কথা মনে এল,—

"তোমার সৌন্দর্য দূত, এড়াইয়া কালের প্রহরী,
যুগে যুগে চলিয়াছে এই বার্তা নিয়া,
ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া..."

এগিয়ে গেলুম আরও সামনে, আরও কাছে গিয়ে দেখতে। সামনে পড়ল মার্বেল পাথরের প্লাটফর্ম। সিড়ি বেয়ে তার উপরে উঠলুম। বসবার আসনে বসে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম।

স্থর্যকিরণ-স্নাত তাজ। অপূর্ব শোভা! সামনের ঝিলে তাকিয়ে দেখলুম, সুন্দর! সমস্ত তাজেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে সেখানে। উজ্জ্বল দিবালোকে তাজের পূর্ণ ছায়া ঈষৎ কম্পমানা জলের সঙ্গে তুলছে। প্রতিচ্ছায়ার সৌন্দর্যের অবদানও অনবদ্য। সহসা চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। পাশ থেকে একজন দর্শক মুগ্ধ হয়ে বলে উঠলেন,—মারভেলাস!

তাকালুম তার দিকে। দেখলুম তিনি যুগপৎ তাজ আর তার প্রতিবিম্বের দিকে তাকাচ্ছেন। কোনটার দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না। চোখে তাঁর অপূর্ব ভাবোচ্ছ্বাসের ছায়া, মুখমণ্ডল সস্মিত। মুগ্ধ হয়ে ব্যাকুল বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছেন তিনি। মুগ্ধ হবারই কথা।

নীচে নেমে গিয়ে ঝিলের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলুম। তাজের প্রতিচ্ছায়া তখনও সুন্দরভাবে দেখা দিচ্ছে। ঝিলের তু'ধারে ঝাউ গাছ। সুবিন্যস্ত ও সুদৃশ্য ভাবে স্তম্ভের আকারে ছাঁটা। আশেপাশে সুন্দর সবুজ তৃণ-মণ্ডিত প্রাঙ্গণ। এরা সবাই মিলে তাজের সৌন্দর্য সাধনে ব্যস্ত।

এগিয়ে গেলুম তাজমহলের প্রান্তে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলুম। তাজমহলের অভ্যন্তর দেখতে হলে আরও এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। নীচের প্রাসাদের ছাদ তাজমহলকে বেষ্টন করে রয়েছে। প্রদক্ষিণ করে তাজকে নানা দিক থেকে দেখতে লাগলুম। এর সৌন্দর্য যেন ফুরোয় না। যে দিক থেকে

দেখা যাক না কেন, এর সৌন্দর্য মনকে বেশ একটা দোলা দিয়ে যায়।

চারিদিক একবার ঘুরে দ্বারপ্রান্তে এসে জুতো ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে তাজমহলের মূল ঘরে এসে উপস্থিত হলুম। তাজমহলটা তখন বিরাট হয়েই দেখা দিল। দূর থেকে যেটাকে ছোট একটা ঘর মনে হয়েছিল, কাছে এসে তার আয়তনের বিশালতা ধরা পড়ল। সাদা মার্বেলের বিরাট গৃহটি মনের মধ্যে বেশ একটা রেখাপাত করল। এর দরজাগুলোও ফতেপুর সিক্রির বুলান্দ দরজার অনুরূপ। আয়তনে তার চেয়ে সামান্য কিছু ছোট, কিন্তু সৌন্দর্যে মহীয়ান।

সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজের কবরের একটু বিশেষত্ব আছে। করবখানাটি দোতলা। নীচের একতলায় রয়েছে আসল দুটি কবর উপরের তলায় অনুরূপ দুটি কবর আছে। উপরেরটি নকল কবর এদের বাহ্যিক অবয়ব নীচে উপরে সমান।

নীচের কবরটি দেখতে হলে সিড়ি বেয়ে একতলায় নামতে হয়। নামবার সিঁড়িটি সুড়ঙ্গ পথের মত অন্ধকার। ঘরটিও চারিদিকে বন্ধ। অন্ধকারের রাজত্ব। হ্যারিকেনের সাহায্যে কবর দু'টি ও গৃহের দেয়ালের কারুশিল্প চারিদিক ঘুরে দেখলুম। হ্যারিকেনের আলোয় ভালভাবে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু যেটুকু দেখা গেল তাতেই বিস্ময়ে অবাক হলুম। নীচে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চারিদিকে যতটা সম্ভব দেখে নিয়ে উপরে উঠে এলুম।

উপরের ঘরটাও নানা কারুকার্য শোভিত। এখন আর কোন মূল্যবান রত্নাদি নেই। সেগুলো চলে গেছে অন্যত্র। শুধু মার্বেল পাথরের উপর নানা রকম রঙীন পাথরের কাজ আর অন্যান্য কারু-

শিল্প শোভা পাচ্ছে। দেওয়ালে পাথর দিয়ে নানা ফুল, লতা-পাতা আঁকানো। মাঝখানে অনুরূপ দু'টি নকল কবর। মার্বেল পাথরের বন্ধ দরজা, খোলা চলে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে খোপ খোপ করে কাটা। তারই ভিতর দিয়ে আলো ও বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। মার্বেল পাথরের মেঝেতেও বিচিত্র কারুকার্য। কবর দুটির চারিদিকে চলবার ব্যবস্থা আছে। গৃহাভ্যন্তরের সৌন্দর্য এখানে বেশ ভালভাবেই চোখের সামনে ধরা পড়ল। একতলার সৌন্দর্যের বিন্যাসও এরই অনুরূপ।

তাজমহলের গম্বুজ তিনটি। মাঝেরটি বড়। চারি দিকে চারটি উচ্চ মিনার। তাজের উপরেও আছে ছোট ছোট মিনার।

ভিতরের কবর দুটোও মার্বেল পাথরের উপর নানা কারুকার্যে ভরা। চারিদিকে মার্বেল পাথরের কারুকার্যময় বেষ্টনীও আছে। তাজমহলের অভ্যন্তরভাগ বার বার দেখে বাইরে এলুম। বাইরে থেকে চারিদিকটা আবার ভাল করে দেখা দরকার। এবার অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছি।

চারিদিক ঘুরে দেখ ত লাগলুম তাজকে। সূর্যকিরণ ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। সন্ধ্যার অরুণাভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাজের উপর। একটা অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাজ। বিরাট দরজা, বিরাট গম্বুজ, বিরাট এর আয়োজন। বড় বড় মার্বেল পাথর সাজিয়ে এই বিরাট সৌধ গঠিত হয়েছে। চারিদিকে বিরাটত্বের মধ্যে সৌন্দর্য-টুকুর অবদানই অনবদ্য।

পিছনে এসে দেখি, তাজমহলের গা ঘেঁষে চলেছে যমুনা। কল কল শব্দে বয়ে যাচ্ছে তার জল। পবিত্র জলের পূতধারা স্নাত হচ্ছে তাজ। তাজ সৌন্দর্যের অপরূপ সৃষ্টি সন্দেহ নেই,

কিন্তু এই সৃষ্টি সাধনায় যমুনার পূতধারার অবদানও কম নয়। প্রভাতের অরুণ আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাজের ছায়া এসে পড়ে যমুনার বুকে।

অদূরে দেখা যাচ্ছে আগ্রার দুর্গ। সম্রাট শাহজাহানের শেষ জীবনের বন্দীশালা। হতাশা ও বেদনার দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকতেন এই তাজের দিকে। কখনো বা নিজের সার্থকতার স্বপ্নে নিজেই বিভোর থাকতেন। মমতাজকে নিজের সৃষ্টির মধ্যে অমর করে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। সাফল্য লাভও করেছেন এই অনবদ্য সৃষ্টির মহিমায়। মমতাজ আজ নেই, তার রক্ত মাংসের শরীর তাজের নীচের কোঠায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্যের অনবদ্য সৃষ্টির আনুকুল্যে মমতাজ আজ সারা পৃথিবীর অন্তরে বিরাজমানা হয়েছেন। সম্রাট শাহজাহানও ধূলিকণায় পরিণত হয়েছেন। দেহী সম্রাট শাহজাহান গত হলেও প্রেমিক সম্রাট শাহজাহান, শিল্পী সম্রাট শাহজাহানকে সবাই অন্তরে উপলব্ধি করে। তাজের সৌন্দর্যকে যারা ভালবাসেন, তাঁরা মমতাজকে ভুলতে পারেন না, ভুলতে পারেন না সম্রাট শাহজাহানের অন্তরের বেদনার কথা। যেটা তাজের রূপ নিয়ে বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তাই সম্রাটের বেদনায় বিধুর হয়ে দর্শকের দল সম্রাটের সৃষ্টির অবদানে হয় আত্মহারা। কবির ভাষায় বলতে হয়,—"শুধু তব অন্তর বেদনা, চিরন্তন হয়ে থাক, সম্রাটের ছিল এ কামনা।"

তাজমহলের একাংশ এখন মেরামত হচ্ছে। ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। বড় বড় বাঁশ লাগিয়ে মেরামতের কাজ চলছে, তাই আশে পাশের ঘরগুলো মেরামতের জিনিসপত্রে বোঝাই।

আজ পূর্ণিমা। সাধারণতঃ রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে তাজের

দুয়ার। আজ দর্শকের আনাগোনা বেশী। তাই রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

ছাদে বসে যমুনার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলুম। দলে দলে লোক আসছে, দেখছে আবার চলে যাচ্ছে। যাবার সময় বার বার তারা ফিরে তাকাচ্ছে। বিদায় নিতে যেন মন চায় না তাদের।

বাপাইয়া বললে, তাজের সৌন্দর্য এমনি জিনিস, যেন পুরানো হতে চায় না। একজন যেন এই সৌন্দর্যের মধ্যে সারা জীবন কাটাতে পারে।

কথাটা অতিশয়োক্তি কিনা জানি নে। তবে এই সৌন্দর্যের যেন একটা আকর্ষণী শক্তি রয়েছে। যেদিকে তাকানো যাক না কেন, বার বার দৃষ্টিটা যেন তাজের দিকেই ফিরে আসে। হয়ত তাজকে ভাল করে দেখে নেবার ইচ্ছাটা যেন ব্যাপকভাবেই দেখা দেয়। সৌন্দর্য জিনিসটা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে, কিন্তু অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করতে না পারলে মনটা সহজেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আর সৌন্দর্য তাকে আনন্দ দিতে পারে না, মনে বিরূপতার সৃষ্টি ক.র। তাই তাজ দর্শনে কেউ বা হয় অভিভূত, কেউ বা একে শুধু মার্বেল পাথরের সমষ্টি মনে করে তৃপ্তি পায় না।

আকাশ জুড়ে ফুটে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। দূর থেকে দেখলুম তাজকে। অপূর্ব সুন্দর! তাজকে দেখতে হলে পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেই দেখতে হয়। জ্যোৎস্না-স্নাত তাজ যেন স্বপ্নলোকের সৌন্দর্যের অধিকারী। দিনের বেলায় আলোর প্রখর্যে যে ছোট-খাট ত্রুটি চোখের সামনে পীড়া দেয়, চাঁদের শুভ্র আলোয় সেগুলোর উপর অফুরন্ত সৌন্দর্যের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়। চোখের উপর এসে পড়ে স্নিগ্ধতার ছায়া ও অপরূপ সৌন্দর্যের আভাস। এগিয়ে

এলুম আবার। দৃশ্যটা অভিনব আকারে দেখা দিল। প্লাটফর্মটার উপরে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে রইলুম তাজের দিকে। ঝিলের উপরে পড়েছে প্রতিবিম্ব। তাজ ও তার প্রতিচ্ছায়া। কোনটার রূপই কম নয়।

তাজের কাছে এলুম। সবাই নানা ভাবে দেখবার জন্য ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমিও মুগ্ধ নয়নে তাজের দিকে চেয়ে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে বাপাইয়া এসে ডেকে নিয়ে গেল একটা অন্ধকার ঘরে। অন্ধকারের মধ্য থেকে জ্যোৎস্না প্লাবিত তাজ অতি সুন্দর দেখায়।

কী অপরূপ! স্বপ্নের মত ভেসে উঠে তাজের রূপ। মার্বেল পাথরের কারুকার্যময় সৌধের উপর এসে পড়েছে চাঁদের শুভ্র আলো। প্রতিফলনে এর শুভ্রতা যেন আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চাঁদের আলোতে কারুকার্যগুলি সুন্দর দেখাচ্ছে। আলোছায়ার খেলা অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে।

মিশ্র আমাদের ডেকে নিল নীচের সবুজ প্রাঙ্গণে। দেখাল রঙীন পাথরে জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হয়ে যেন তারকামণ্ডলী সৃজন করেছে তাজের মাথায়। সৌন্দর্যে অভিভূত হলুম।

মিশ্র বললে, চাঁদের আলোতে তাজের যে রূপ আজ দেখলুম, সেটা জীবনেও ভুলতে পারা যাবে না।

বাপাইয়া জানাল, কথাটা ঠিক। আনন্দটা উপলব্ধির জিনিস। মন সেটা গ্রহণ করে সুচারু পরিবেশ ও অনুভূতির সাহায্যে। তাজ এই দুটোরই সহায়ক। তাই, তাজকে দেখতে হলে চাঁদের আলোতেই দেখা ভাল। তখন এ হয় বিরাট সৌন্দর্যের অধিকারী।

মনের অনেকাংশ জুড়ে এ আনন্দ ও বিস্ময়ের প্রভাব বিস্তার করে। দিনের বেলার তাজ, আর রাতের আলোর তাজে তফাৎ অনেক।

অনেকক্ষণ কাটল তাজে। রাত হয়েছে অনেক। মিশ্র বাস্তববাদী হয়ে উঠল। জানাল, এখনই রওনা হওয়া দরকার। নইলে আহার ও ফিরতি ট্রেন কোনটাই পাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

তাজের সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে একটা টাঙ্গা করে সহরে ফিরে চললুম। আহারান্তে জিনিসপত্র নিয়ে আগ্রা ক্যাণ্টনমেণ্টে উপস্থিত হলুম। আগ্রা সহর থেকে ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশন প্রায় দুই মাইল দূরে। গাড়ী আসারও একটু বিলম্ব আছে। প্লাটফর্মের এক প্রান্তে বসে রইলুম।

বার বার মনে আসতে লাগল তাজের কথা। তাজ তো শুধু একটা মার্বেল সৌধ নয়, মার্বেল স্বপ্ন। এর পিছনেও রয়েছে করুণ ইতিহাস। মমতাজ যখন মারা যান, তখন তাঁর চৌদ্দটি সন্তান ছিল। সবাইকে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় রেখে গিয়েছিলেন। মমতাজের শোকে অধীর হয়ে সম্রাট শাহজাহান এক সময়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প পর্যন্ত করেছিলেন। এর পরে তাঁর করুণ শোকাবহ জীবন শুরু হয়।

শাহজাহান ছিলেন শিল্পী, প্রেমিক, সৌন্দর্যরস পিপাসু। তাজমহল তাই তাঁর শিল্পী মনের পরিচিতি, প্রেমিকের আশ্রয়স্থল, সৌন্দর্যের সাধনার দান। তাই আজ বিদায় বেলায় বিশ্বকবির সেই কথাটাই মনে পড়ল,—

> "এই কথাটি মনে রেখো তোমাদের এই হাসি খেলায়।
> আমি যে গান গেয়েছিলাম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥"

জয়পুর

রাজস্থান—প্রাচীন ঐতিহ্যময় এই রাজস্থান। শৌর্যবীর্য গরিমায় কত ইতিহাসের কাহিনী জড়িত আছে এখানে। মোগল ও পাঠান শক্তির প্রচণ্ড দাপটে সারা ভারত যখন টলমল করছিল, তখন এই রাজস্থানই রেখেছিল হিন্দু শৌর্যের গরিমা। শুষ্ক মরুভূমিসম রাজস্থান। পাহাড় বেষ্টিত রাজস্থান শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন রাজস্থান, বীর্য-সেবী রাজস্থান যুগপৎ প্রকৃতির রুক্ষতা ও স্নেহ অবলম্বন করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। সারা রাজস্থানের বুকে আছে এর রক্ত মোক্ষণের পরিচিতি।

ছোটবেলা থেকেই এ স্থান দেখবার ইচ্ছা ছিল অদম্য। সুযোগের অভাবে অদম্য ইচ্ছাটাকেও দমন করতে হয়েছিল। সুবিধা এসে পড়ায় সদলবলে রওনা হবার ব্যবস্থা হলো। আমাদের দলে ছিলেন ত্রিশ জন। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা এবং গুজরাট থেকে পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যেরই লোক ছিলেন এই দলে। রাজ-স্থানেরও তিন বন্ধু ছিলেন। সবাই মিলে বড় একটা বাস ভাড়া করে দিল্লী থেকে রওনা হলুম রাজস্থান অভিমুখে। ভাড়া পড়ল মাইল পিছু এক টাকা। দেড় হাজার মাইলের উপর ভ্রমণ করবার ব্যবস্থা হলো। বাসে গেলে নানা স্থানে ভ্রমণের স্বচ্ছন্দ গতি পাওয়া

যায়। তাছাড়া রাজস্থানী বন্ধুত্রয় সঙ্গে থাকায় ভ্রমণ পথে নির্বিঘ্নতার পরিচয় পাওয়া যাবে। বাসটিতে ৫৪ জন লোকের বসবার স্থান ছিল, কাজেই হাত-পা ছড়িয়ে বসবার সুযোগ মিলল।

১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সদলে দিল্লী থেকে রওনা হলুম। তীব্র গতিতে বাস দিল্লীর সীমানা পেরিয়ে এসে পড়ল পাঞ্জাব রাজ্যে। রাস্তার দু'ধারে দেখা গেল অসংখ্য নিম গাছ। রবি-শস্যের শ্যামল ক্ষেত। দূরে আকাশের গায়ে মিলিয়ে বিস্তীর্ণ পাহাড় শ্রেণী। রাস্তার দু'ধারে, যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই আকাশে যেন নীল শাড়ীর কাল পাড় বিছিয়ে প্রকৃতি দেবী ধ্যানমগ্না। স্বচ্ছ ঘোলাটে পাড়ের আকারে আকাশের গায়ে পাহাড় বিছানো। মনে পড়ল গানের ছত্র দু'টী,—"আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ।"

রাস্তা ভাল। বাসও চলতে লাগল দ্রুতগতিতে। পাহাড়গুলি নানান ভাবে এসে দেখা দিতে লাগল। একটার পর আর একটা পাহাড় শ্রেণী এসে দৃষ্টিপথে উদয় হয়। মাঝে সমতল ভূমির উপর দিয়ে রাস্তা। রাস্তার দু' ধারে গাছের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসতে আরম্ভ করল।

শোনে সহরে এসে পড়লুম। ছোট সহর এটা। বাসটা ক্ষণিকের জন্য থামল। বাইরে তাকিয়ে দেখি ঘাঘরা, সার্ট আর ওড়না পরা একটি মেয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অদূরে অদ্ভুত ধরণের এক বাঁকানো করাত দিয়ে তক্তা তৈরি হচ্ছে। রাজস্থান এখান থেকে অনেক দূর। সবে মাত্র ৩৫ মাইল এসেছি আমরা।

গুঁরগাঁও জেলা সহর অতিক্রম করে বাস চলল। পাঞ্জাবের

অন্তর্গত সহর এটা। সহর ছোট, কিন্তু মন্দ নয়। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভাল। বাস অপেক্ষা করল না। অনেকটা পথ যেতে হবে।

রাজস্থানের এলাকায় আসতে হলে একটা গেট পার হতে হয়। এক রাজ্যের সীমানা পার হয়ে আর এক রাজ্যে যেতে হলেই সীমান্ত অঞ্চলে বাস থামিয়ে সরকারী পর্যবেক্ষণ চলে। তাই পথের মাঝে বাস বার তিনেক থামল। রাজস্থানের এলাকায় ঢুকে পড়লুম। এখান থেকে আলোয়ার ২৩ মাইল দূরে। আলোয়ার জেলা সহর। পূর্বে মহারাজার খাস রাজ্য ছিল। স্বাধীনতার পর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আলোয়ার সহরটি পাহাড়ের সানুদেশে। ছোট সহর, কিন্তু বেশ গোছানো। পাহাড়ের উপর ছোট একটা দুর্গ আছে। সহরের অনতি দূরে একটা বিরাট হ্রদ। তারপরেই ঘন সন্নিবিষ্ট পাহাড়। আলোয়ার ঢুকবার আগে সমৃদ্ধ একটা পল্লীতে আমাদের বাস থেমে-ছিল। আমাদের সহযাত্রী জনৈক বন্ধুর বাসস্থান এখানেই। এখানকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। আমাদের নিয়ে গেলেন হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে। চেয়ার টেবিল জমায়েত হ'ল। চা পান আর সেউ ভক্ষণ করে আমরা আবার বাসে চাপলুম। বন্ধুর ছেলেমেয়েরা সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরল। ছোটছেলেটী তার কোলে চেপে বসল। সবাইকে আদর করে বিদায় দিয়ে তিনি বাসে এসে উঠলেন।

হাইস্কুলের প্রাঙ্গণে দেখলুম একটা বেদীর উপরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। তার উপর পর পর দুটো কলসী। জলধারা শিবলিঙ্গের উপর ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে। সামনে একটা ষাঁড়, মহাদেবের বাহন ও তার পাশে পার্বতীর মূর্তি। পরিবেশটা বেশ ভাল লাগল।

আলোয়ার থেকে জয়পুর। দীর্ঘপথ। চারিদিকে কেবল পাহাড়ে

ঘেরা। ছোট বড় নানারকম পাহাড় চারিদিকেই দেখা গেল। কখনও বা বাস চলল দুধারে পাহাড় রেখে, কখনও বা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, আবার কখনও পাহাড়ের বুক বেয়ে উপরে উঠে পরক্ষণেই নীচে নামতে আরম্ভ করল। বাস চলতে লাগল উঠানামার দোদুল দুলে। চারিদিক চেয়ে দেখি মাটীর পাহাড় মিলিয়ে গেছে। তার স্থান অধিকার করেছে কঠিন প্রস্তরের পাহাড়। চারিদিকের প্রস্তরময় পাহাড়ের কঠিনতা ভেদ করে দেখা দিয়েছে ছোট ছোট গাছ। কোথাও বা তার চিহ্নটুকুও নেই। শুধুমাত্র নীরস কঠিন কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বিরাট মুখব্যাদান করে রয়েছে। পাহাড়ের বুক চিরে রাস্তা বের করা হয়েছে। আর তারই আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে চলেছে বিরাট অজগরের মত আমাদের বিপুলকায় বাসটি।

থরে থরে এই পাহাড় সাজানো। প্রকৃতিদেবী যেন রাজস্থানকে পাহাড়ের বেষ্টনী দিয়ে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এই পাহাড়-ঘেরা প্রান্তরে গজিয়ে উঠেছে নানা শস্য শ্যামল ক্ষেত্র। গম, যব ও রবিশস্যে ভরপুর। এর কোনটা পেকে ঈষৎ হরিদ্রাভ হয়েছে, কোনটা এখনও রয়েছে হরিৎ। পাহাড়ের বুক বয়ে আসা জল সযত্নে রক্ষা করে অনেক কষ্টে এখানে চাষের ব্যবস্থা করতে হয়।

গাঙ্গেয় সমতট আর অনুরূপ স্থান ছাড়া ভারতের অধিকাংশ স্থানই পাহাড় পর্বতে ঘেরা। রাজস্থানের অধিকাংশই আবার শুধু পাহাড় পর্বতেই ঘেরা নয়; শুষ্ক, নীরস বালুভূমি। চারিদিকে চেয়ে দেখেছি শুধু মনসা জাতীয় গাছ। বাবলা গাছ আর ছোট ছোট গাছে ভরা জমি। বালুময় জমি। জলাভাবে কোন চাষ করার উপায় নেই। বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পড়ে আছে বিনা আবাদে। ধূ ধূ করছে প্রান্তর। অনেকদূর চলার পর দেখা যায় ছোট একটা গ্রাম। লোকজনের বসতি অনেক

কম সেখানে। যেখানেই একটু জলের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানেও লোকজন বাস করবার চেষ্টা করেছে। জল সংগ্রহ করতে হয় এদের অনেক কষ্টে। পাহাড়ের জল আটকে রেখে জলাশয় সৃষ্টি হ'ল তো ভাগ্যের কথা, নইলে গভীর কূপ খনন করে বলদ বা উটের সাহায্যে কখন বা কপিকল বসিয়ে হাতের সাহয্যে অনেক নীচ থেকে জল তুলে আনতে হয়। রাজস্থানী মেয়েরা তাই কঠিন পরিশ্রমী। মাথায় ঘড়ার উপর ঘড়া বসিয়ে এ'রা জল নিয়ে যান। ভারসাম্য বজায় রাখতে এদের অসাধারণ নিপুণতা।

জয়পুরে এসে পৌঁছলুম অনেক রাতে। আশ্রয় মিলল স্থানীয় একটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। রাতটা কাটিয়ে পরদিন প্রাতে সহর দেখতে বের হওয়া গেল।

রামবাগ প্রাসাদ দেখলুম। সহরের একপ্রান্তে এটা স্থাপিত। মহারাণা আগে এই প্রাসাদে থাকতেন। সম্প্রতি সহরের অভ্যন্তরে নিজ প্রাসাদে চলে গেছেন। প্রাসাদটি বর্তমানে গেস্ট হাউসে পরিণত হয়েছে। যে কেউ এখানে থাকতে পারেন, তবে মাথা পিছু দৈনিক ভাড়া পড়ে চল্লিশ টাকা। গৃহটি সুন্দর নানা কারু-কার্য শোভিত। দোতলা ঘর, আয়তনেও বৃহৎ। সামনের সুদৃশ্য বাগানে নানা রঙের মরশুমী ফুল ফুটে রয়েছে। প্রাসাদ-সংলগ্ন ফলের বাগানটিও অনেক বড়। বহু আমের গাছ, তাতে ফুটে রয়েছে অজস্র মঞ্জরী।

জয়পুর সহরটি বেশি পুরাণো নয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে সওয়াই প্রথম জয়সিং এই সহরটি নির্মাণ করেন। ইনি নিজে ছিলেন

বৈজ্ঞানিক। দিল্লী, মথুরা, কাশী, উজ্জয়িনী ও জয়পুরের যন্তর মন্তর এর অনবদ্য সৃষ্টি। সহরের রাস্তাগুলো বড়। সারা সহরটাই প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সহরে ঢুকবার জন্য সাতটি গেট আছে। নাম গুলোও তার সুন্দর। চাঁদ পোল, সূরজ পোল, শিব পোল, দুর্গা পোল, গঙ্গা পোল, কৃষ্ণ পোল ও ত্রিপোলিয়া।

জয়পুর সহরকে বলা হয় "লালচে রংয়ের সহর"। কেউ কেউ একে ময়ূরের দেশ নামেও অভিহিত করেন। কেউ বলেন, ভারতের প্যারিস। সহরের বাড়ীগুলি বেশির ভাগই লালচে রঙের, নানা কারুকার্যে ভরা। শিল্প সৌন্দর্য চিত্তাকর্ষক। অনেক নতুন ঘরবাড়ী উঠছে মূল সহরকে কেন্দ্র করে। সেগুলো সুন্দর ও আধুনিকতার নিদর্শন।

হাওয়া মহল দেখলুম। পাশেই মহারাজার হাই স্কুল। রাস্তার দুধারের এই দুটো ঘরই সুদৃশ্য। হাওয়া-মহল সুদক্ষ শিল্পীর সৌন্দর্যের অভিব্যক্তির প্রকাশ। জ্যোৎস্নাস্নাত অবস্থায় এই গৃহের দৃশ্য মনকে মুগ্ধ করে। তবে এর বাইরের দৃশ্য যতটা সুন্দর, ভিতরটা তত নয়। পাঁচতলা এই বিরাট গৃহটি বায়ু চলাচলের জন্য বহু জানালা শোভিত। স্থাপত্যের দিক দিয়ে এই সুন্দর নয়নরঞ্জন গৃহটি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

অম্বর দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ দেখতে রওনা হলুম। জয়পুর থেকে ছ' মাইল দূরে পাহাড়ের উপর এই দুর্গ। পাহাড় বেষ্টন করে রয়েছে মাউটকা হ্রদ। চারিদিকের দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণী এই দুর্গ-টিকে সু-রক্ষিত করত।

পাহাড়ের উপর উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা এই দুর্গ। সহসা একে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করা যেতো না। দুর্গে ঢোকবার পথ দুটি। একটায় ছোট মোটর যান নিয়ে যাওয়া যায়, আর একটা পায়ে চলার পথ। আমাদের বাসটা বড়, কাজেই পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে চললুম।

সামনে পড়ল একটা ছোট মিউজিয়ম। বহু পুরাতন দেব-দেবীর মূর্তি দেখা গেল। নবম শতাব্দীর বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও শীতলা দেবীর মূর্তি। খৃষ্টপূর্ব তিনশ বছর আগের নানা সুরঞ্জিত পাত্র, বড় পানাধার ইত্যাদি রক্ষিত আছে এখানে। খৃষ্টপূর্ব ছয় শত বছরের ভাঙ্গা মৃন্ময় পাত্রও দেখলুম। এছাড়া আছে নানা মূল্যবান প্রাচীন মূর্তি ও দ্রব্যাদি।

জালেবচকে এলুম। এখান থেকেই প্রাসাদে ঢুকতে হয়। তার জন্য দর্শনী লাগে পনের নয়া পয়সা। সিংহ দরজা পার হয়ে ঢুকলুম দেওয়ান-ই-আমে। মহারাণার সাধারণ দরবার মার্বেল পাথরের সুদৃশ্য ঘর। নানা সূক্ষ্ম কারুকার্য। ২০টি লাল পাথরের আর ১৬টি মার্বেল পাথরের স্তম্ভের উপর এই ঘর। আয়তনে মোগল সম্রাটের দেওয়ান-ই-আম থেকে অনেক ছোট। দেওয়ান-ই-আমের পাশে স্তম্ভের উপর আর একটি সুদৃশ্য ঘর।

প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা চিত্র শোভিত। গেটের উপরে গণেশের মূর্তি, তাই একে বলা হয় গণেশ পোল। এই গণেশ পোলের ভেতর দিয়েই প্রাসাদে ঢুকতে হয়।

সোহাগ মন্দির একটি সুদৃশ্য ঘর। গণেশ পোলের উপরে অবস্থিত। মার্বেল পাথর কেটে খোপ-খোপ করে তৈরি করা হয়েছে বায়ু চলাচলের

পথ। এরই মধ্য দিয়ে মহারাণীরা দেখতেন দেওয়ান-ই-আমের দরবার। ঘর ছোট, কিন্তু সুচারু।

দেওয়ান-ই-খাস ও শীষমহল। শীষমহল কাচের কাজে বোঝাই। পাশাপাশি দুটো ঘর। ঘর দুটোর আগাগোড়া আয়নার টুকরো লাগানো রয়েছে। দেওয়ালে সুন্দর চিত্রাঙ্কণ। রঙীন কাচেরও অভাব নেই। সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে। ভিতরে কোন প্রদীপ জ্বালালে অসংখ্য প্রদীপের চিত্র সারা ঘরটায় ফুটে উঠে। ঘরটা দোতলা, উপরেও অনুরূপ ঘর। মার্বেল পাথরের দেওয়ালে নানা রকম লতা-পাতা-ফুল আঁকানো। এর সামনে রয়েছে ফোয়ারা, উদ্যান ও মহারাণীদের খেলবার স্থান।

অন্দর মহলে বার রাণীর ঘর। এগুলো তেমন সুদৃশ্য নয়। একটা দরজায় বহু পুরাতন রাধাকৃষ্ণের মূর্তি অঙ্কিত দেখলুম। অনেক স্থান অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ভোজনশালাটি দেখবার জিনিস। কাশী, হরিদ্বার, মথুরা ইত্যাদির চিত্র সম্বলিত।

প্রাসাদের পাশেই শীলা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরটি রাজা মানসিংহ ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করেন। মার্বেল পাথরের মন্দির। মার্বেল পাথরের স্তম্ভে অত্যুৎকৃষ্ট নক্সার কাজ। মন্দিরের দুয়ারে দুপাশে মার্বেল পাথরের উপর আঁকা রয়েছে দুটো কলাগাছ। সবুজ ও নীল রঙে আঁকা কলাগাছ দুটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পরিপোষক। অঙ্কণ প্রণালীও শিল্প-চাতুর্যের নিদর্শন। মাঝখানে নাট-মন্দির। পরিবেশটি সুন্দর।

ভিতরে রয়েছেন মহাকালী। এখানে সবাই এঁকে পার্বতী দেবী নামে অভিহিত করেন। মহাপীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই মহাকালী।

দেবী প্রতিষ্ঠার একটি ইতিহাস রয়েছে। দেবাদিদেব মহাদেব যখন সতীদেহ স্কন্ধে ধারণ করে রুদ্রতাণ্ডবে মত্ত হন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীদেহ খণ্ডিত করেন। সারা ভারতে একান্নটি স্থানে মহাসতী দেহের অংশ পতিত হয়। এই একান্নটি স্থানই মহাপীঠস্থান নামে খ্যাত এবং ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ-স্থান রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। এটুকু পৌরাণিক। এই একান্নটি পীঠস্থানে তাই যুগ যুগ ধরে কোটী কোটী তীর্থ যাত্রীরা মায়ের দর্শন করে ধন্য হন ও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেন। এই একান্নটি তীর্থস্থানের অন্যতম তীর্থস্থান খুলনা জেলার যশোরেশ্বরী ধাম। বর্তমানে এ স্থান পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে। প্রতি বছর এখানেও দলে দলে যাত্রীরা মাতৃদর্শনে তৃপ্ত হন।

বাংলার শেষ রাজা মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই যশোর ধামে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।—

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপাদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।..."

তাঁর প্রবল বিক্রমে তদানীন্তন ভারত সম্রাট আকবর পর্যন্ত বিব্রত হন। বিদ্রোহ দমনে তাঁকে পাঠাতে হয় প্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহকে। বিপুল সৈন্য নিয়ে রাজা মান সিংহ বাংলায় পৌঁছেন এবং নানা প্রচেষ্টা ও চক্রান্তের সাহায্য নিয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করতে সক্ষম হন। বন্দী অবস্থায় প্রতাপাদিত্য দেহত্যাগ করেন। সেই সময় রাজা মানসিংহ মহা পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাকালীর মূর্তি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে স্বীয় অম্বর প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই মা এখানে অধিষ্ঠিতা আছেন।

এখনও নিত্যপূজা হয় মায়ের। দলে দলে যাত্রী এসে মায়ের পূজা ও দর্শনলাভ করে বিভোর হয়ে যান।

মন্দিরের সোপানে উঠলুম। সস্মিত নয়ন মুর্তি। দেখলে শুধু মাত্র নয়নই জুড়ায় না, হৃদয়ও উদ্বেল হয়ে উঠে। কত আপনার ধন এই মা। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের রূপের কী অপূর্ব অভিব্যক্তি! বিশ্ব জগতের সমস্ত শক্তির আধার, সর্বগুণময়ী, সর্বগুণাশ্রয়ী, স্নেহ-ময়ী রূপে বিরাজমানা জগৎমাতা। সমস্ত হৃদয় যেন উজাড় হয়ে পড়ল মায়ের চরণে। শরণাগত আমি, দীণার্ত আমি, তুমি আমায় পরিত্রাণ করো। সর্ব মঙ্গলের তুমি আধার, শুভের উৎস তুমি, তুমি আমাকে করুণা কর মা। তোমার শরণ লাভে যেন সমর্থ হই।

মায়ের কাছে ছোট ছেলে আনন্দ উচ্ছল। কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, ভয় নেই, হিংসা-দ্বেষ নেই, শুধু আছে ভালবাসা আর ভরসা। ছোট ছেলে জানে, মা রয়েছে তার কাছে, আর কোন জিনিস চাইতেও হবে না, মায়ের স্নেহই সন্তানের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে। মা জানেন, ছেলের কাছে কোনটা ভাল। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সেও তো মায়ের স্নেহেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তির প্রকাশ। ছেলেকে একটু গড়ে-পিঠে খাঁটি করে নেবার বিভিন্ন রূপের পরিচিতি। যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে আমরা কেঁদে মরি, সেও তো মায়েরই স্নেহের একটা ছলনা। জগৎ জননীর শিশু সন্তান আমরা। সংসারের মায়া-মোহের কুয়াশার আবরণে ঢাকা রই, মা পাশে থেকেও চলে যান আড়ালে। তাই হঠাৎ যখন মায়ের দেখার অনুভূতিটুকুও মনে আসে, মনটা আনন্দে দুলে উঠে। কেমন যেন ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগে মনে। সে আকঙ্ক্ষার যেন কূল নেই, কিনারা নেই, অনন্ত অসীম সেটা।

আমরা ভুলে যাই। সংসারে কর্মক্ষেত্রের বাঁধনে দিশাহারা হয়ে পড়ি; মোহের কড়ি নিয়ে খেলায় মত্ত হই, ছোট ছেলে যেমন সাময়িকভাবে মাকে ভুলে যায় খেলতে গিয়ে। ভিতরের আমিত্ব বোধটা দানা বেঁধে মাকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। দেখতে দেখতে এসে পড়ে নোটিশ। চুল পাকে, দাঁত পড়ে, গায়ের চামড়া ঝুলে পড়ে, দেহের শক্তি নষ্ট হয়। মোহাচ্ছন্ন মানুষ তখনও আমিত্বের খোলস থেকে মুক্ত হতে চায় না, চারিদিকে নিজের সৃষ্ট খেলাঘরকে আঁকড়ে রেখে নিজের রচনায় নিজেই মোহে বিভোর হয়। মহামায়ার মায়া এমনি জিনিস।

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।

প্রণাম করলুম মাকে, অন্তরের আবেদন জানিয়ে। অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ল। রাজা প্রতাপাদিত্যের গড়া যশোর নগরের ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে চলেছি দেবী যশোরেশ্বরী মন্দিরের দিকে। রাজা প্রতাপাদিত্যও নেই, তাঁর রাজ্যও নেই, আছে শুধু তাঁর শৌর্যবীর্যের প্রতীকরূপে ধ্বংসস্তূপ; আর তার জ্বলন্ত সাক্ষী মহা পীঠস্থান আর তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নতুন মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল আসনের উপর। দেখেছি সেখানে ভক্তের সমাগম আর তাদের প্রাণের আকুলতা; মায়ের স্মিত নয়নে স্নেহ ও করুণার আভাস।

আজ দীর্ঘদিন পরে দেখতে পেলুম দেবী যশোরেশ্বরী মহাকালী মাতাকে অম্বর প্রাসাদের একপ্রান্তে। রাজা মানসিংহও নেই, মোগল ছায়ায় পালিত সে জৌলুষও নেই, রাজ্যও নেই। পুরাতন প্রাসাদ আর তার ভগ্নস্তূপ এখন পুরাকীর্তি হিসাবে রক্ষিত হচ্ছে। মানুষের ক্ষুদ্র পরমাণুসম শক্তির খেলা সব শেষ হয়েছে। শুধু আছে

অম্বরের পাহাড়ের মাতৃমূর্তি। আপন মহিমায় আপনি বিভোর। করুণা সমন্বিত নয়ন থেকে যেন সুধা ক্ষরিত হচ্ছে।

বিদায় নিলুম মার কাছ থেকে। নয়ন থেকে মাকে বিদায় দিলুম বটে কিন্তু অন্তরে রইলেন তিনি চির বিরাজমানা।

কিন্তু সত্যিই কি সেটা সম্ভব? এই ভঙ্গুর অন্তর নিয়ে মাকে যোগ্য আসন দেবার সামর্থ কি আমার হবে! সব জিনিসই তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে, কিন্তু চাইবারও তো একটা যোগ্যতা থাকা দরকার।

অম্বর প্রাসাদে থেকে পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে নীচে নেমে এলুম। জগৎশরণজীর মন্দিরে যাবার পথ ধরলুম। অম্বর প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোণে প্রাসাদ দুর্গ থেকে খানিকটা দূরে এই মন্দির। খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার খানিকটা পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উপরে উঠে মন্দিরের দুয়ারে উপস্থিত হলুম।

প্রথমেই পড়ল একটা মার্বেল পাথরের কারুকার্যখচিত গেট। মন্দিরটি সুদৃশ্য। ভিতরে মার্বেল পাথরের নাট-মন্দির। এখানে গরুড় নাগবাহন হয়ে যোড়হস্তে উপবিষ্ট। স্তম্ভগুলিতেও নানা মূর্তি শোভিত।

মন্দিরটি দোতলা। ছাদে রাজস্থানের নানা চিত্র শোভা বর্ধন করছে। মহারাণী কর্ণাবতী তাঁর ছেলে জগৎ সিংএর স্মরণার্থে এই মন্দির স্থাপনা করেন ১৬০১ খৃষ্টাব্দে। ইনি ছিলেন মহারাজা মানসিংহের পত্নী।

মন্দিরে কৃষ্ণ মূর্তি। রাজা মানসিংহ এ মূর্তি চিতোর থেকে এনে এখানে স্থাপনা করেন।

অম্বর প্রাসাদের পথে আছে জলমহল। মহারাজার শিকারের স্থান। যেন একটা বড় হ্রদ।

জয়পুর সহরে ফিরে এলুম। বন্ধুবান্ধবেরা আহারের সন্ধানে হোটেলের দিকে রওনা হলেন। আমার ছিল শিবরাত্রির উপবাস। শঙ্করজী দর্শনের জন্য মনটা ব্যাকুল ছিল। শিবরাত্রির দিনে ঠাকুর দর্শনের জন্য মহারাজার প্রাসাদের একটা দ্বার খোলা থাকে। উপবাসী বন্ধুদের সঙ্গে শঙ্করজী সন্দর্শনে প্রাসাদের দিকে রওনা হলুম।

গোবিন্দদেবের মন্দিরে এলুম। গোবিন্দদেবের প্রসন্ন নয়ন। মন্দিরে শিবলিঙ্গও স্থাপিত রয়েছে। প্রণাম ও ভক্তি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

জয়পুরে দেখবার অনেক জিনিস রয়েছে। তার মধ্যে যন্তর মন্তর একটি। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবহারিক শিক্ষালাভের জন্য এটা মহারাজ জয়সিংহের অপূর্ব সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। এইটাই ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সুন্দর।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। একটা সানডায়াল দেখলুম। এর দৈর্ঘ সাড়ে চৌদ্দ ফুট। ধ্রুব নক্ষত্র দেখবার যন্ত্র, তারার গতি ও অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র। সূর্যের ছায়া দেখে অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্র, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ নির্ণয় যন্ত্র, তারা ও গ্রহ নির্ণয় যন্ত্র ইত্যাদি বহু যন্ত্র-সমন্বিত যন্তর মন্তর। এর কোনটা মার্বেল পাথরের তৈরি। ভিতরে নানা দাগ কেটে গতি ও স্থান নির্ণয়ের চিহ্ন দেওয়া আছে। কোনটা বা পিতলের গোলাকৃতি যন্ত্র, আবার কোনটা

লোহার ধ্বজার ন্যায়। ক্রান্তি বৃত্ত, রাশিচক্র ইত্যাদি জানবার ব্যবস্থা এখানে আছে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি পুরাতন এবং বৈজ্ঞানিক সম্মত ছিল, ব্যবহারিক শিক্ষার এই যন্তর মন্তর তারই সুস্পষ্ট পরিচিতি জানিয়ে দেয়।

যন্তর মন্তরের পাশেই মহারাজার প্রাসাদ। প্রথমেই পড়ে জালেবচক। এই চকে এখন চলছে সরকারী আফিস ও আদালত। এর সামনেই টাউনহল। বর্তমানে এখানে বিধান সভার অধিবেশন বসে।

প্রাসাদের মধ্যে দেওয়ান-ই-আম। প্রাসাদটি দোতলা। এখানে রাজ পরিবারের মহিলারা বাস করেন!

চাঁদের মহল দেখবার জিনিস! সাততলা দালান। নীচের তলাকে বলা হয় পিতম নিবাস। দ্বিতল কক্ষটি শোভা নিবাস। নানা রকম আয়নার কাজে ভরপুর। গৃহটি সুন্দর ও রুচির পরিচায়ক। এই চাঁদ মহলের পাশেই গোবিন্দদেবের মন্দির।

পাঠাগার ও অস্ত্রশালাটি দেখবার জিনিস। পাঠাগারে "রাজসনামা" নামক একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। পারস্য ভাষায় মহাভারত লেখা। আকবরের সময় রচনা। অস্ত্রশালায় প্রাচীন অস্ত্রাদি রক্ষিত আছে!

ঈশ্বরলক্ষ্মী চাঁদপোল গেটের কাছে, সাত তলা উঁচু বিজয় স্তম্ভ এটা। দেখতে সুন্দর ও সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ত্রিপোলিয়া গেটটি সুন্দর। এই গেট দিয়ে শুধু মাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ঢুকতে পেতেন। গেটের কারুকার্য ও সৌন্দর্য দর্শকদের চিত্তরঞ্জন করে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। পরদিনের জলযোগের জন্য কিছু ফল-মিষ্টি কিনে

নিলুম। সফেদা, কলা, পেঁপে, পেড়া আর বরফি। দাম খুব বেশি নয়।

জয়পুর সহরে জল সররবাহ হয় আঠার মাইল দূরের রামগড় বাঁধ থেকে। জলাধারটির আয়তনও ছয় বর্গ মাইল।

জয়পুর রাজধানী সহর হলেও হাইকোর্ট রয়েছে যোধপুরে। খনি সংক্রান্ত বিষয়ের হেড অফিস উদয়পুরে ও শিক্ষা বিভাগ এবং কৃষি সংক্রান্ত বিভাগের হেড অফিস যথাক্রমে বিকানীর ও কোটায়। রাজস্থানে প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে একুশটি নৃপতির রাজ্য ছিল। স্বাধীনতার পরে এই সব রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরে রাজস্থান রাজ্যের উৎপত্তির সময় বিভিন্ন স্থানে হেড অফিস স্থাপনা করে সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ব্যবস্থা হয়।

অলঙ্কার, মার্বেল পাথরের তৈয়ারী জিনিসপত্র, খেলনা, ছাপা কাপড় ইত্যাদির জন্য জয়পুর বিখ্যাত। একটা দোকানে গিয়ে কিছু মার্বেল পাথরের মূর্তি কিনলুম। ভেবেছিলুম, অন্য জায়গার থেকে দাম কিছু কম হবে। কিন্তু ফল দেখলুম বিপরীত। দাম ছাড়তে কেউ রাজী নন।

বাপুজী বাজারে নানা দোকানের সমারোহ। মির্জা ইসমাইল রোডটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। রাজধানী সহর। তাছাড়া রাজস্থানের মধ্যে এইটাই বড় সহর। কাজেই লোকজনের সমারোহও কম নয়।

রাজস্থানে জাতিভেদ প্রথা প্রবল। সহরের মেয়েদের পর্দা প্রথা কমে আসছে, কিন্তু গ্রামের রাজপুত ও মুসলমানদের মধ্যে পর্দা প্রথা প্রবল।

রাজস্থানে পুরুষেরা পরেন ধুতি-জামা, মাথায় পাগড়ী ও পায়ে নাগরা জুতা। মেয়েরা পরেন ঘাগরা, ব্লাউজ বা জামা, ওড়না ও

পায়ে নাগরা জুতা। অলঙ্কারের বাহুল্যও অনেক। সারা হাতে, কোমরে, শিরোভূষণে, পায়ে বৈচিত্র্যমূলক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। সম্প্রতি শাড়ির প্রচলন হয়েছে অনেক। পুরুষেরাও কেউ কেউ পায়জামা ও হাওয়াই সার্ট পরেন। যুবক মহলে অথবা চাকুরিয়া মহলে হওয়াই সার্ট ও প্যান্টের একচেটিয়া অধিকার প্রায় সারা ভারত জুড়েই রয়েছে।

রাজস্থানী চিত্রকলা ভারতের প্রাচীন কৃষ্টির ধারক। দেয়াল অঙ্কনে এঁরা বিশেষ পটু। জয়পুরে অনেক গৃহেই আছে দেওয়াল চিত্রণ। গ্রামাঞ্চলেও এ চিত্রের অভাব নেই। নানা দেব দেবীর চিত্র, ফুল-লতা-পাতা। অশ্বারোহী মানব অথবা হস্তীপৃষ্ঠে মানবের চিত্র অনেক দেওয়ালেই দেখতে পাওয়া যায়।

পথে দেখেছি উটের সমারোহ। কোথাও বা উটের পিঠে জিনিস বোঝাই করে নাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোথাও চালক উটের পিঠে উঠে দুলতে দুলতে চলেছে। দলে দলে উট শুষ্ক মাঠে বাবলা বা অন্য কিছু খাদ্যের সন্ধানে বিচরণশীল। এদের প্রত্যেকের গায়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়, যাতে না হারিয়ে যায়।

ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যাও প্রচুর। এরা আপন মনে বিচরণ করে। শুষ্ক তৃণ, কোথাও বা হরিদ্রাভ ঘাস খুঁজে নিয়ে নির্বিবাদে ভক্ষণ করে। ঘোড়ার সংখ্যাও অনেক। গাধাও আছে, তবে ঘোড়ার সংখ্যাই বেশী।

গরুর গাড়ীগুলো অদ্ভুতভাবে তৈরি। কোনটায় আছে ছোট গোল চাকার উপরে কাঠের পাটাতন। চাকা বেশ পুরু। কোনটার পাটাতন আবার উটের পিঠের মত বাঁকানো। চারধারে বাঁশ লাগিয়ে বেড়া দেওয়া আছে।

রাজস্থানীরা মিষ্টদ্রব্য ও আচার খেতে ভালবাসেন। রুটির এক পাশে ঘি অথবা দালদা লাগিয়ে দই বা মিষ্টদ্রব্যেই আহার শেষ করেন অনেকে। তরকারীর অভাবই এর কারণ। আলু মটরের প্রচলনই তরকারীর মধ্যে বেশী। আলু চাকা চাকা করে কেটে নিয়ে শুকনো করে বিক্রয় করা হয়। কপির আমদানী কম। তরকারীও আবার ঝাল দিয়ে খেতে ভালবাসেন।

রাজস্থানবাসী বন্ধুবর স্বরূপ বললেন, রাজস্থানবাসীদের জিনিস হচ্ছে এই, দাল, ভাটি (ঘিয়ে ভাজা ময়দা), চূরমা (ময়দা ও চিনি সংযোগে) খাটা (ঘোল), রাবড়ী, সেপ (ব্যাসনের ঝুরি), পাঁপর, খিঁচে (চালের পাঁপর), কেঁড় (সজ্জী), ঘাঘরা, ঘুঙুর, গুংগট (পর্দা)।

বন্ধুবান্ধবেরা চলে গেছেন সহর পরিভ্রমণে। তাঁদের আগমণের প্রতীক্ষায় বাসে বসে চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল। অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা পাহাড়ের শীর্ষদেশে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠল। সন্ধ্যায় ছায়া ক্রমশঃ পাহাড়ের বুক ছেয়ে ফেলল। চতুর্দশীর অন্ধকারে পাহাড়গুলি আকাশের গায়ে ক্রমশঃ কাল মসীরেখার মত শোভা পেতে লাগল। সারাদিনের উপবাস ও ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

বন্ধুবান্ধবেরা ফিরে এলেন অনেকটা রাত করে। বাসে চেপে আবার ফিরে এলুম আশ্রয়স্থলে।

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশ সেরে বের হলুম গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনে। জয়পুর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে সাঙ্গানের গ্রামে

এসে পৌঁছলুম। আসবার পথে পড়ল মতিডুঙ্গরী। ছোট একটা দুর্গ, মুক্তার মত তার আকৃতি। মহারাজার গ্রীষ্মাবাস।

সাঙ্গানের গ্রামে অনেক দেখবার জিনিস আছে। এখানকার জৈন মন্দিরটি সুন্দর। ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি চিত্তাকর্ষক মিউ-জিয়ম আছে। নাগরমল জয়পুরিয়া দশ হাজার টাকা ব্যয় করে শিশুদের জন্য এই যাতুঘরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। প্লাস্টার অফ প্যারিসে গড়া পশুপক্ষীর নানা মূর্তি, কাচের আধারে নানা রকমের মাছ, জলকষ্ট নিবারণের ব্যবস্থার দেওয়াল চিত্র, বিভিন্ন পতঙ্গের রক্ষিত দেহ, মেবারের বীর রাণাদের চিত্র, রাজস্থানী মেয়েদের বিভিন্ন অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন রূপ নৃত্যের চিত্র, ভারতেব বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বহু জিনিসের সমাবেশ সেখানে। সবগুলিই সুন্দর ও রুচিকর। ছোট এলাচীর খোসা দিয়ে ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি পাখিও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষণীয় আরও বহু জিনিস এখানে সংরক্ষিত আছে। শিশুদের জন্য এই যাতুঘর স্বতঃই দর্শকের মন আকৃষ্ট করে।

হাতে তৈরী কাগজের একটা কারখানা দেখলুম। পুরানো ছেঁড়া কাগজ দিয়ে তৈরী করা হয় মণ্ড, সেগুলো আবার জলে ধূয়ে পরিস্কার করে ধূলোর আকারে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। পরে স্তরে স্তরে সেগুলোকে তুলে নিয়ে দেয়ালে শুকিয়ে কাগজ তৈরী করা হয়। সাঙ্গানের অধিবাসীরা এই কাজ প্রায় পাঁচশ বছর ধরে করে আসছেন। সমবায় সমিতি বর্তমানে এই কাজ চালাচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ জানালেন, হাতে তৈরী এই কাগজ কলে তৈরী কাগজের চেয়ে দশগুণ বেশী শক্তি ও স্থায়িত্বসম্পন্ন। এক তা কাগজ অনায়াসে একজন মানুষকে বহন করবার যোগ্যতা রাখে।

বন্ধুবর দেওকর কাগজের শক্তি পরীক্ষার জন্য এগিয়ে এল। স্থির হল কাগজের উপর তাকে বসিয়ে কাগজের চার প্রান্ত ধরে তাকে টেনে শূন্যে তোলা হবে। দেওকর কাগজের উপর দিব্যি আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। চারজন চার কোণ ধরে তাকে শূন্যে টেনে তুলল। ক্যামেরা তৈরীই ছিল। ফোকাস ঠিক করবার মুহূর্তেই সাফল্যের উল্লাসে দেওকর সহসা একটা হুঙ্কার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের একটা কোণ ছিঁড়ে গিয়ে দেওকর হল পপাত ধরণীতলে। ফটো আর তোলা গেল না। অষ্টবক্র হয়ে দেওকর কোনমতে উঠে দাঁড়াল। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লেন।

সাঙ্গানের গ্রামে ক্যালিকো প্রিন্টের কাজ দেখলুম। গ্রামের লোকেরাই নিজে ডিজাইন করে ব্লক তৈরী করে নিয়ে শাড়ী, টেবিল ক্লথ বিছানার চাদর ইত্যাদি ছাপিয়ে সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় করে। এবিষয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে তারা।

সাঙ্গানের গ্রামে একটা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা আছে। এই সংস্থা থেকে এইসব সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে। এই সংস্থার মাধ্যমে কতকগুলি শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে একটা প্রচেষ্টা অভিনব। জেলের কয়েদীদের বাইরে এনে অনেকটা স্বাধীন পরিবেশে শিল্প শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নতুন ও ফলপ্রদ বলে মনে হল। এরা সম্প্রতি বড় বড় সতরঞ্চি তৈরী করছে। একটা সতরঞ্চি নির্মাণ অবস্থায় দেখলুম সুন্দর হয়েছে। কয়েদীরা এ ব্যবস্থার ফলে যা উপার্জন করে, সে অর্থ হবে তাদের

নিজস্ব। অপরাধীদের সৎপথে নেবার এই অভিনব কর্মপদ্ধতি নতুন ও সংশোধনের সহায়ক।

সাঙ্গানের গ্রামে অনেকগুলি মন্দিরও আছে। চূড়াগুলি নানা কারুকার্যে ভরা। গ্রামের প্রায় বাড়ীতেই দেয়াল চিত্র আছে। কোন কোন দেয়ালে রাজস্থানী মেয়েদের ছবি আঁকা; কোন বাড়ীর সামনে গণেশের চিত্র। বাড়ীর ভিতরেও দেয়াল চিত্র দেখলুম। সবগুলিই রঙিন চিত্র। দেয়াল চিত্রণ রাজস্থানবাসীদের অতি প্রিয় জিনিস।

জলাভাবে পরিচ্ছন্নতার অভাব খুবই বেশি। কাপড় ময়লা দেখাবার ভয়ে অনেকেই রঙিন বস্ত্র পরেন। মেয়েরা সাধারণতঃ ছাপা ঘাগরা ও রঙ্গীন জামা ওড়না পরেন। ঘাগরা ও ওড়না কখনও এক রঙের দেখতে পাইনি। গ্রামের পুরুষেরা সাধারণতঃ লাল রংয়ের কাপড়ের পাগড়ীর ভক্ত। হলদে বা সাদা রংয়ের পাগড়ীও দেখেছি, তবে তার সংখ্যা অনেক কম।

সাঙ্গানের গ্রামের পাশে আর একটা গ্রামে শিরীষ (Glue) তৈরীর কারখানা দেখলুম। জীবজন্তুর দেহাবশেষ এনে জাল দিয়ে শিরীষ আঠা তৈরী করা হচ্ছে।

দ্বিপ্রহরের আবার ফিরে এলুম সহরে। আহারান্তে গেলুম রামনিবাস বাগানে। এরই অভ্যন্তরে মিউজিয়ম ও চিড়িয়াখানা আছে।

মিউজিয়মের গৃহটী সুন্দর। এর পাথরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি চিত্তাকর্ষক। সামনেই দেবী সরস্বতীর মূর্তি। তার তলে লেখা রয়েছে,

যা দেবী সর্বভূতেষু কলা রূপেণ সংস্থিতা,
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

শিল্প স্থাপত্যে গৃহটির রূপ অতুলনীয়। রাজস্থানীর স্থাপত্যের সুন্দর পরিচিতি। দেয়াল চিত্রণ সুদক্ষ কলা শিল্পীর সুচারু রুচি-বোধের পরিচায়ক। মিউজিয়মের জিনিসপত্রাদিগুলোও সারা পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা। পিতলের জিনিসপত্র, পারস্য দেশীয় গালিচা, ভারতীয় চিত্রকলা, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার ও মূর্তি সংগ্রহ দেখবার জিনিস।

সংগৃহীত দ্রব্যাদি মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ব্যবসায়মূলক, ঐতিহাসিক, শিক্ষণীয় ও আর্থিক। মিউজিয়মটী চার তলা। তার উপরেও একটা গম্বুজ ঘর। একতলা আর দোতলা নিয়েই গঠিত মিউজিয়ম।

নানা মূর্তি সংগ্রহ দেখবার জিনিস। মার্বেল পাথরের অষ্টভূজা দুর্গামূর্তি দেখলুম। বাংলার তৈরী জিনিসও আছে। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের পূর্ণ কাঠামোসহ দুর্গামূর্তি শুধু মাত্র শিল্প প্রতিভারই পরিচয় দেয় না পরন্তু বাংলার সংস্কৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপও উদঘাটিত করে তোলে।

মিউজিয়মটি ছোট কিন্তু রুচির পরিচায়ক। এর সামনে দীর্ঘ রাস্তা। তার দুপাশে চিড়িয়াখানা। একধারে পশু ও অপর ধারে পাখীর আস্তানা। চিড়িয়াখানাটি খুব ছোট।

সন্ধ্যায় ফুলের একটা প্রদর্শনী দেখলুম। চারিদিকে ফোয়ারা আর আলোর ঝরণা, তার মধ্যে এই প্রদর্শনী। ভারতের প্যারিস রূপে, রচনায়, কলাশিল্পে ও সংস্কৃতির অবদানে ভারতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে দেশবিদেশের দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে সন্দেহ নেই।

আজমীঢ়

জয়পুর থেকে রওনা হলুম আজমীঢ়ের পথে। বাস চলতে লাগল পূর্ণবেগে। পথের দুধারে দেখলেন উঁচুনীচু বালির স্তূপ, অসংখ্য বাবলা গাছ আর মনসা জাতীয় কাঁটা গাছ। পাতা নেই তাতে। ছোট ছোট গুল্ম নানাজাতের। এর কোনটা শুকিয়ে গেছে, কোনটা হয়েছে অর্ধ ধূসর, আবার কোনটায় ঈষৎ সবুজ অংশ দেখা যাচ্ছে। ধূ ধূ করছে প্রান্তর। চাষবাস নেই। রুক্ষ প্রকৃতির কর্কশ চিহ্ন। সূর্যের তাপে বালি গরম হয়ে উঠছে। বাসের ভিতরে চলে আসছে উষ্ণ হাওয়া। দূরে সরে যেতে লাগল সব পাহাড়। দিগন্তে কাল মসীরেখা তার শুধু অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে সেটাও মিলিয়ে গেল। শুধু রইল শস্যহীন ধূসর প্রান্তর আর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বাবলা গাছ।

অনেকক্ষণ চলবার পর দেখা গেল দু' একটা সবুজক্ষেত। ছোট খাট দু' চারটে ঘর বাড়ী। দিগন্তে আবার পাহাড়ের রেখা ফুটে উঠল। রাজস্থানী বন্ধু ডাণ্ডিয়া বললেন, কিষণগড়ের কাছে এসে পড়েছি আমরা।

রাজস্থানের রূপের এই বৈশিষ্ট্য। যে পথে চলেছি আমরা, সেইটাই রাজস্থানের সেরা অঞ্চল। অথচ তারই কি রুক্ষ মূর্তির পরিচয় পেলুম। প্রকৃতিকে নিংড়ে নিয়ে মানুষ বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু যেখানে নিংড়ে নেবার কোন উপায় নেই, সেখানে সে হয়েছে নিরুপায়। তবু

নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে, বুদ্ধির কৌশলে নীরসকেও সরস করেছে মানুষ। তাই প্রতিপদে প্রকৃতির রুক্ষ অন্তরকে সরস করবার জন্য মানুষের চেষ্টারও অন্ত নেই। প্রয়োজন বুদ্ধির খেলা। নব নব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে বিপুল আয়োজন করে প্রকৃতি দেবীর কাঠিন্য ভেদ করবার ঐকান্তিক প্রয়াস। ভাক্‌রা নাঙ্গাল তারই প্রতীক। শুষ্ক রাজস্থানকে শস্যশ্যামল করে তুলবারও বিরাট আয়োজন চলছে।

শর্মা বলল, এখানে যদি পাঁচশ একর জমি পেতুম, তাহলে চাষবাস করে সুন্দর করে তুলতুম।

বললুম তাকে, প্রকৃতিদেবী যেখানে নিতান্ত অকরুণাময়ী সেখানে তার সরস হৃদয়ের পরিচিতি জানাতে দরকার হবে অনেক শর্মার। এক শর্মা এখানে করবে কি?

শর্মা আমার কথায় হতাশ হয়ে জনান্তিকে অনুরূপ তার আশা ব্যক্ত করে সমর্থনের সুযোগের সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু সাড়া না পেয়ে উদাস মনে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

বাস এসে পড়ল কিষণগড়ে। সবাই প্রাতরাশের জন্য নেমে গেলেন। সহরটা ছোট একটা পাহাড়ের উপর। অদূরে রেল ষ্টেশনে একটা মালগাড়ী প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করছে। বাড়ীগুলো সব পাথরের তৈরী। পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সুদূরে চলে গেছে। সুদূর দিগন্তে তার মসীরেখার ছাপ।

বাসে ফিরে এসে দেখি তুমুল কাণ্ড। মধ্য ভারতের দেওকর ও মিশ্র, বিহারের সিংহ, অন্ধ্র প্রদেশের বাপাইয়া আর কেরলের পিল্লে সবাই মিলে তার স্বরে কি একটা গান জুড়ে দিয়েছে। আর মধ্যপ্রদেশের

শিং বাজাচ্ছেন ঢোল তাণ্ডব রবে। সঙ্গীতটা রাষ্ট্রভাষায় কি সর্ব ভারতীয় ভাষাগুলির সমন্বয়ে, সেটা ঢোলের প্রচণ্ড নিনাদে ধরা গেল না। বাসটাও তার সঙ্গে তাল রেখে সশব্দে ছেড়ে দিল। সঙ্গীত তাতে থামল না। বরঞ্চ গতিটা বাড়ল।

জানালা দিয়ে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলুম। বাসটা একটা পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল। এবার চড়াই পথ। বাসটা প্রচণ্ড শব্দ করে আঁকা বাঁকা পথে উঠতে লাগল। নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি, হঠাৎ এর সুর ভেসে উঠল ইংরাজীতে। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, লঙ্গ লাইফ টু ইউ। দৃষ্টিটা বাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনলুম। সঙ্গীত আজ বাঁধনহারা হয়েছে, তাই পথে বিপথে চলতে তার আর কোন বাধা নেই।

পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বাস এসে থামল আজমীড়ে।

আজমীড়। মুসলমানদের তীর্থস্থান। মোগল সম্রাট আকবর স্বয়ং আসতেন প্রতি বছর খাজা ময়েনউদ্দিন চিশতি সাহেরের দরগায়। প্রার্থনা জানাতেন সন্তান কামনার জন্য। জাহাঙ্গীরের জন্ম হবার পরও আগ্রা থেকে আজমীড়ে এসে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন তিনি।

আজমীর সহরটাও পাহাড়ের উপর। প্রাচীন শহর। অলিগলিরও অন্ত নেই। ষ্টেশনের পাশে ও বাজারের মধ্যে আছে বড় ক্লক টাওয়ার দুটো।

আমরা স্থান পেলুম একটা স্কুলের হোষ্টেলে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হল হোটেলে। প্রাতরাশ সেরে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিপোষিত মেয়েদের একটা শিক্ষণ কেন্দ্র দেখলুম। রাজস্থানে গ্রামের মেয়েদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি নতুন একটা পরিকল্পনা

চলছে। গ্রামের মধ্য থেকে সাধারণতঃ বর্ষীয়সী মেয়েদের নিয়ে এই শিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহিলারা এসে এই কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করছেন। শিক্ষা সমাপ্ত হলে এঁরা গ্রামের মধ্যে কুড়িটি পরিবারের মধ্যে এঁদের কার্যপন্থা অনুসরণ করে চলবেন। সাফল্য লাভের পর আবার নতুন কুড়িটী পরিবারের মধ্যে কার্য সম্প্রসারিত হবে। এমনিভাবে সারা গ্রাম ও পরবর্তী পার্শ্ববর্তী গ্রামে কার্যক্রম সম্প্রসারণের কাজ চলবে। এঁদের বলা হয়, "গ্রাম কাকী"। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্থানই প্রথম এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করলে সারা ভারতে এর বিস্তৃতির সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষার্থী গ্রাম কাকীরা গান গেয়ে আমাদের অভ্যার্থনা জানালেন। গানটার অর্থ সংক্ষেপে জানালেন ডাণ্ডিয়া, "বসন্তের গানে তোমাদের অভিনন্দন জানাই. হে নবাগত উত্তর দেশের লোক, তোমাদের জানাই আমাদের প্রীতি।

সমবেত সুরে সঙ্গীতের ঝঙ্কারটা ভালই লাগল। এঁদের সঙ্গে আলাপও হল। বেশ সাদা মন, সহজেই আপন করে নেবার ইচ্ছা। সারা গায়ে অলঙ্কার এঁদের। গলায় বড় রূপার হাঁসুলি, সিঁথিতে শিরোভূষণ। হাতে দশ বারো গাছা চুড়ি ও পায়ে মল এঁরা সবাই পরিধান করেছেন।

মেঝেতে আলপনা দেওয়া হয়েছে। এঁরা তাকে বলেন, রংগুলি। সবুজ ও লাল রঙের ত্রিকোণাকৃতি অথবা গোলাকার বৃত্ত করে তার মধ্যে নানা ফুল লতা পাতা আঁকানো। রাজস্থানের গ্রামাঞ্চলেও এর বিশেষ প্রচলন আছে।

আমাদের খেতে দিলেন নানারকম খাবার। সব ভুট্টার ছাতু

থেকে তৈরী করা হয়েছে। পুরী, সমোসা (সিঙ্গারা) ক্ষীর, খিঁচুড়ী, পাকৌড়ি, হালুয়া, চুরমা আরও অনেক রকম খাবার।

শ্রীমতী রায় এঁদের চিত্তবিনোদনের জন্য খরতাল বাজিয়ে গান ধরলেন, চাকর রাখোজ্জী—। দেওকর, বাপাই ও শ্রীমতী মেহতা তাতে সুর জোগালেন। গ্রাম কাকীরা এতে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

এঁদের হাতের কাজ দেখলুম। শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক সে সব কাজ।

শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ে বিদায় নিলুম। এবার চললুম পাহাড়ের শীর্ষদেশে। সার্কিট হাউস এখানে। এর বারান্দা থেকে আজমীড় সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। নীচে দীর্ঘ বিস্তৃত আনা সাগর। সূর্য কিরণে জল চকচক করছে। পাশের পাহাড়ের চূড়ায় হনুমানজীর মন্দির সূর্যকিরণে স্নাত হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে।

চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা আজমীড় শহর। পাহাড়গুলি যেন প্রাচীরের ন্যায় সহরটীকে বেষ্টন করে রয়েছে। চারিদিকে দিগন্ত জোড়া পাহাড়; পাহাড়ের উচ্চ ভূমিতে সহর; একপ্রান্তে বিশাল আনা সাগর সহরটার সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে।

শ্রীমতী রায় বললেন, এখানে একটি সোনার লঙ্কা আছে শুনেছি। হেসে বললুম, রাবণ রাজার রাজধানী ছিল নাকি এটা। উজ্জ্বল দীপাবলী শোভিত সেই স্বর্ণলঙ্কা।

মৃদু হেসে জানালেন তিনি, সেটা না হলেও এর স্বর্ণময় রূপ দেখে আশ্চর্য হবেন।

সুতরাং দেখবার আকাঙ্ক্ষা হল। এবং সবাই মিলে সেখানে হাজির হলুম।

বড় একটা জৈন মন্দির। সত্যই দেখবার জিনিস। মানুষের সাজানো সৌন্দর্যে অতুলনীয়। স্বর্ণলঙ্কা না দেখ্‌তে পেলেও সোনালী

রঙের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। দোতলা থেকে নীচের দৃশ্যটা খুব ভালভাবে দেখতে পাওয়া যায়। শূন্যে সোনালী রং করা হাঁস, ময়ূর ও মকরাকৃতি নৌকার উপর নানামূর্তি! নীচে মাঝে একটা স্তম্ভ এবং তাকেই কেন্দ্র করে একটা গোটা সহরের পরিকল্পনা দেখানো হয়েছে। দেয়ালে চিত্রাঙ্কণ নানারকমের। ছাদেও নানাভাবে আয়না বসানো। জিনিসপত্রের বেশীর ভাগই সোনালী রং করা। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাইরেও মার্বেলের উপর নানা কারুকার্য। মার্বেল পাথরের মূর্তিও রয়েছে ভিতরে। জৈন মন্দিরের সামনে মার্বেল পাথরের তৈরী মানুষ ও হস্তী। লাল পাথরের গেটটীও সুদৃশ্য ও সুন্দর। অভিনব উপায়ে গৃহ, গৃহাভ্যন্তর ও পরিবেশকে সুন্দর করে তোলা হয়েছে। আজমীড়ের এই মন্দিরটী আধুনিক হলেও দর্শককে অভিভূত করে তোলে।

সহরটা ঘুরে দেখতে লাগলুম। রাস্তার আয়তন অপরিসর। জেলা সহর। জন বাহুল্যও প্রচুর। উঁচু অপরিসর রাস্তাগুলিতে গাড়ী চলাচল করতে পারে না।

খাজা ময়েনউদ্দিন চিশতি সাহেবের দরগা দেখলুম। অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। নবম শতাব্দীর দরগা। প্রতি বছর ভারতের নানাস্থান থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয় এখানে।

প্রথমেই একটা বড় গেট। গেটে উপরে নহবৎখানা। গাইড জানাল, সম্রাট শাহজাহান ও উদয়পুরের মহারাজার অর্থানুকূল্যে সেটা নির্মিত হয়েছে। এই দরগা নির্মাণে বহু হিন্দু মহারাজা ও মুসলমান সম্রাটের অর্থানুকূল্য আছে।

খাজা ময়েনউদ্দীন চিশতি সাহেব ছিলেন বড় পীর। হিন্দু

ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই তিনি ভালবাসতেন। তাই দরগায় সবাই শ্রদ্ধা জানায়।

দ্বিতীয় গেটের পাশে দুটো খুব বড় হাঁড়ী দেখতে পাওয়া গেল। এর একটায় ১২০ মণ আর অপরটায় ৬১ মণ ভাত রাঁধা চলে। উৎসব উপলক্ষে এই হাঁড়ী দুটীতে ভাত রাধা হয়। এছাড়া দরগায় নিত্য দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

গাইড জানালেন, শাহজাহান কন্যা জাহানারা বেগম দরগার গৃহটী নির্মাণ করেছিলেন। মার্বেল পাথরের তৈরী দরগা। সোনালী রংএ খচিত। দেয়ালে আরবী অক্ষরে কোরান শরীফ লেখা রয়েছে। ভিতরে রৌপ্যখচিত দরগা কাপড় দিয়ে ঢাকা ও তার উপরে অজস্র গোলাপ ফুল। দরগার পাশের ঘরে আর একটী কবর আছে। গাইড জানাল, সেটী খাজা সাহেবের মেয়ের কবর। শাহজাহান কন্যা রোশেনারা বেগমেরও কবর এখানে আছে।

দরগার পাশে একটা পুকুর। নীচে নামবার জন্য একটা সিঁড়ি। পাহাড়ী ঝরণা থেকে জল ঝরছে পুকুরে। দরগার উপরে একটা গম্বুজ, সেটি সোনার পাতে মোড়া।

দরগার পাশে মার্বেল পাথরের সুন্দর একটা মসজিদ। বাইরে দরিদ্র নিবাস। আহারের আশায় অনেক লোক অপেক্ষা করছে।

শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলুম।

পাহাড় বেয়ে খানিকটা উঠে আর একটা পুরানো মসজিদ দেখতে পেলুম। একে বলা হয় "আড়াই দিনের ঝুপড়ী"। প্রবাদ, শাহজাহানের নমাজ পাঠের জন্য এই মসজিদটী নাকি আড়াই দিনে

তৈরী করা হয়। মসজিদের গায়ে কোরান শরীফ লেখা। মসজিদটী অর্ধভগ্ন। এখন আর নমাজের কাজে ব্যবহৃত হয় না। ভিতরে মসজিদের দেয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি দেখলুম। পূর্বে এটা হয়ত হিন্দু মন্দির ছিল। ভেঙ্গেচূরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অথবা অন্যস্থানে বিধ্বস্ত হিন্দু মন্দির ও তার দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে এই মসজিদটী তৈরী করা হয়েছে। দেবদেবীর মুখ অনেক স্থলে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো ভাল আছে তার মধ্যে বিষ্ণু মূর্তি, নারায়ণ এবং অনেক দেবমূর্তি দেখা গেল। তাছাড়া শঙ্খ পদ্ম ইত্যাদিও নানা স্থানে পাথরে উৎকীর্ণ অবস্থায় দেখা গেল। বস্তুতঃ পক্ষে হিন্দু স্থাপত্যের বহু নিদর্শন এই মন্দিরে দেখতে পাওয়া গেল।

পাশের পাহাড়ে খুব ছোট একটা দুর্গ দেখতে পাওয়া গেল। শুনলুম, ওটা তারাগড় দুর্গ। পাহাড়ের শীর্ষদেশে স্থাপিত। বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই। রাজস্থানের অনেক পাহাড়েই এমন ছোট দুর্গ অনেক দেখতে পাওয়া যায়।

দৌলতবাগ দেখতে গেলুম। সম্প্রতি এর নাম পরিবর্তন করে সুভাসবাগ রাখা হয়েছে। বাগানের মধ্যে ছোট একটা ঝিল ও তার মধ্যে চলছে ফোয়ারা। ফুলবাগানে ফুটেছে নানারকম মরশুমী ফুল। এই বাগানের তত্বাবধান করেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী। নেতাজীর প্রতি নগর পালকদের শ্রদ্ধার প্রতীক এই সুভাসবাগ। সুভাসবাগের পাশেই আনা সাগর। এই আনা সাগর নির্মাণ করেন। অনঙ্গ পাল। পৃথ্বীরাজের মাতামহ। পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান

এই আনা সাগরের শ্রীবৃদ্ধি করেন। মার্বেল পাথরের কতিপয় সুরম্য গৃহ নির্মাণ তাঁরেই সৃষ্টি। বসবার ঘর পাঁচটি, গৃহের সঙ্গে একটি বারান্দা। এসব ঘর থেকে বিশাল আনা সাগরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে এসেছিলুম। আনা সাগরে অস্তগামী সূর্যের প্রতিবিম্ব, মার্বেল পাথরের উপর রৌদ্রের প্রতিফলন এবং পাহাড়ের গায়ে রক্তিমাভা সব মিলে স্থানটাকে পরম রমণীয় করে তুলেছিল। পাহাড়ে ঘেরা এই বিশাল হ্রদটী এমন একটা সুন্দর পরিবেশ সৃজন করে তোলে যে একবার চোখে পড়লে দেহ ও মনে আনন্দের ধারা বয়ে যায়। চোখটাকেও সহসা ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।

আনা সাগর থেকে ফিরবার পথে আর একটী জৈন মন্দির দেখলুম। মন্দিরটী ছোট, কিন্তু কারুকার্য সুন্দর। রাস্তায় ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বিকটাকার এক মুখোস পরে অদ্ভুত গান করে একটা লোক চানাচূর বেচছে। তার আশে পাশে ভিড়টাও বড় কম হয়নি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। একটা টাঙ্গায় ফিরে এলুম।

পুষ্কর

আজমীড় থেকে রওনা হলুম পুষ্কর তীর্থে। পথ মাত্র সাত মাইল। বাস ও ট্যাক্সি সার্ভিস আছে। রেলওয়ে, আউট এজেন্সীও আছে। আজমীড় পর্যন্ত রেলপথে এসে রেলের মোটরে পুস্কর পর্যন্ত যাওয়া যায়।

আমাদের বড় বাসটা এঁকে বেঁকে চলল পাহাড়ের গা বেয়ে। পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে দুরূহ পথ। চওড়া বেশী নয়। অত্যন্ত সতর্ক দৃঢ় হস্তে ড্রাইভার বাস চালাতে লাগল। ক্রমশঃ উঁচুতে উঠতে লাগলুম। এক পাশে দেখা গেল কাল কাল পাহাড় মুখব্যাদান করে রয়েছে। আর একপাশে পাহাড়ের গভীর খাদ। দেখতে দেখতে পাহাড় শ্রেণীর বেষ্টনীর মধ্যে পৌঁছে গেলুম। চারিদিকেই কেবল পাহাড়। নীচের রাস্তাগুলি পর পর সিঁড়ির মত চোখের সামনে ধরা পড়ল। বহু দূরে নীচে একটা লরী আসছে। দেখে মনে হল যেন একটা খেলনা গাড়ী স্প্রিংয়ের সাহায্যে নড়াচড়া করছে। পাহাড়ের দিকে তাকাই। কঠিন পাহাড় তবু তার গা বেয়ে গজিয়ে উঠেছে দু' চারটে গুল্ম জাতীয় গাছ। নীচু পাহাড়ে মনসা জাতীয় গাছের অস্পষ্ট ক্ষীণ রেখা ভেসে উঠে। বাস ক্রমশঃ উপরে উঠছে। চারিদিকের পাহাড়ের চূড়া আকাশের গায়ে ভেসে

আছে। কোথাও বা রৌদ্র কোথাও বা ছায়ার খেলায় একটা কল্প-লোকের মত দেখাচ্ছে।

বাস নামতে আরম্ভ করল এবার। শব্দের প্রচণ্ডতা তাতে কমল কিন্তু দৃশ্যের বিচিত্রতা বাড়ল। পাহাড়ের বুক বেয়ে বড় বাসটা অজগর সাপের মত নেমে এল। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে পিছনে কেবল পাহাড় আর বিচিত্র শোভা।

পুষ্কর তীর্থে এসে পড়লুম। বাস আর এগোবে না। সামনের রাস্তা ছোট। বন্ধু-বান্ধবেরা নেমে পায়ে হেঁটে সহর দেখতে বের হলেন।

দেওকর ও শ্রীমতী রায়ের সঙ্গে এসে পড়লুম পুস্করের ঘাটে। পুষ্কর তীর্থ বড় একটা পাহাড়ে ঘেরা পুকুর। এখানে স্নান করতে হয়। হিন্দুদের এটা পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

পুস্কর তীর্থ বহু প্রাচীন এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাতীর্থের একটী। একে বলা হয় তীর্থরাজ। মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও পুস্করকে মহাতীর্থরূপে বর্ণনা করা আছে। ভগবান রামচন্দ্র এইখানেই পিতা দশরথের শ্রাদ্ধকর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। শাস্ত্রে পুস্করকে আদ্যতীর্থ উল্লেখ করা আছে। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থরাজ পুস্করের মাহাত্ম্য বর্ণন আছে।

পৌরাণিক কাহিনী পঠনে জানা যায় যে ব্রহ্মার হস্তস্থিত কমল থেকেই হয়েছে পুস্করের উদ্ভব। ব্রহ্মা একবার স্থলে যজ্ঞ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং হস্তস্থিত কমল ভূতলে নিক্ষেপ করেন। এই পুষ্প তিনটি স্থানে পতিত হয় এবং তিন স্থানেই নির্মল জলাশয়ের উদ্ভব হয়। জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কনিষ্ঠ পুস্কর নামে যে তিনটী জলাশয় খ্যাত হয়, এখানেই ব্রহ্মা তাঁর যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন এবং তার পর থেকেই এই বিশিষ্ট তীর্থের উদ্ভব হয়।

বাস থামা মাত্রই এক পাণ্ডাজী আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন। শ্রীমতী রায় তাঁর সাহায্যেই পুষ্কর তীর্থ ও সাবিত্রী মাতার দর্শনকার্য সমাধা করবেন স্থির করলেন। ইতিমধ্যেই অনেক পাণ্ডাজী তাঁকে ঘিরে ফেলল এবং তার নাম ও ঠিকানা জেনে নিয়ে চেলে গল।

শ্রীমতী রায় ফুল ও নারকেল কিনে নিলেন এবং পাণ্ডাজীর সাহায্যে পুস্করের ঘাটে নিবেদন করলেন। পাণ্ডাজী যা সংস্কৃত উচ্চারণ করলেন, তার অনেকটাই বোঝা গেল না। যেটুকু গেল সেটুকু হিন্দী ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণ। তীর্থক্ষেত্রে বিদ্যা থেকে ভক্তির দাম বেশী। শ্রীমতী রায় তার চরণ বন্দনা করে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও আপন মনে মন্ত্রোচ্চারণ করে অর্ঘ্য দিয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে দিলুম। স্নান করা আর ঘটে উঠল না। পুস্করের জল অপরিষ্কার এবং কচ্ছপ ও মাছে ভরা।

শ্রীমতী রায় সাবিত্রী পাহাড়ে যাবেন পূজো দিতে। সঙ্গে করে একটি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডও এনেছেন। মন্দিরে স্থাপনা করবেন। স্বামীর অসুস্থতার সময় এই মানত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ সময় চলে গেছে। মানত পূরণ করা আর ঘটে উঠেনি। তাই যখন সুযোগ এল, শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও মানতের সাফল্য কামনায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

কিছু ফুল ও মিষ্টি কিনে নিয়ে পাণ্ডাজীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজন সাবিত্রী পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলুম। সাবিত্রী মন্দির পুস্কর থেকে প্রায় তিন মাইল। অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সে পথ। গরম হাওয়া আরম্ভ হলে পথের অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠে। সৌভাগ্য-ক্রমে এখনও সে হাওয়া বইতে আরম্ভ করেনি। তাড়াতাড়ি

পূজো সেরে যত শীঘ্র সম্ভব ফেরা দরকার; নইলে কষ্টের পরিসীমা থাকবে না।

দেড় মাইল পথ বালির আর দেড় মাইল পথ পাথরের। ছুটোই পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে। শ্রীমতী রায় জুতো ছেড়ে চলতে চাইলেন। পাণ্ডাজী নিষেধ করলেন তাতে। খালি পায়ে একটু এগোতেই পায়ে একটা ছোট কাঁটা বিঁধল। অগত্যা তিনি আবার জুতো পরেই এগোতে লাগলেন।

জুতো পায়ে বালি পথে এগোনো মুস্কিল। প্রতি মুহূর্তে জুতো শুদ্ধ পা বালির ভিতর ঢুকে যায়। রাস্তার পাশ দিয়ে গেলেও কাঁটা গাছ পা তুটোকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগোতে হল।

পিছনে একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখি প্রকাণ্ড এক খেরুয়া বাঁধা খাতা হতে নিয়ে আর একজন পাণ্ডাজী শশব্যস্তে ছুটে আসছেন। দেখলুম বালি পথ তার গতি বেগকে বাধা দিতে পারছে না।

খাতা খুলে তিনি শ্রীমতি রায়কে তার বিরাট বংশ পরিচয় শোনালেন। জানা অজানা অনেক আত্মীয়ের নামই তাতে প্রকাশ পেল। এদের অনেককেই শ্রীমতী রায় দেখেননি বলে জানালেন। কিন্তু আত্মীয়তার কথা স্বীকার করলেন। পাণ্ডাজীও তার পাণ্ডাত্ব দাবী করে বসলেন। শ্রীমতী রায় পড়ে গেলেন মুস্কিলে। এরূপ অকাট্য দাবীকে উপেক্ষা করা চলে না। অথচ পাণ্ডা তিনি ঠিক করে। ফেলেছেন আগেই। অনেক যুক্তি ও মিষ্ট কথায় তাকে বশ করা গেল না অগত্যা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে তাকে শান্ত করে বিদায় দিতে হল।

সূর্য্যের তাপ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বালিও তেতে উঠেছে। শ্রীমতী রায় চলেছেন সেই তপ্ত বালির ভিতর দিয়ে। আমার

জুতার ভিতরও ঢুকে পড়ছে বালির কণা। পায়ের তলা শির শির করছে। পায়ের সঙ্গে চলছে বালির ঘর্ষণ। বার বার বালি ঝেড়ে নিয়ে সতর্কভাবে এগোতে লাগলুম। এর আগে গেছে শিবরাত্রির উপবাস। দেহটা হয়ে রয়েছে দুর্বল। দীর্ঘ পাহাড়ী পথ এই দুর্বল দেহেই পাড়ি দিতে চলেছি শুধুমাত্র মনের জোরে। পারব কিনা জানিনে, তবু একটা দুর্বার ইচ্ছা আমার দুর্বল দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল। দেওকরের দিকে তাকিয়ে দেখি সে নির্বিকারভাবে চলেছে ভারী পাথরটা বহন করে। যুবক সে। পাহাড় ভ্রমণেও অভ্যস্ত। বললে, দিদিকে সাবিত্রী মন্দিরে নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।

বালির রাস্তা আর সহজে ফুরাতে চায়না। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে বালি। তারই উপর দিতে এগোতে হবে। অল্প অল্প বায়ু বইতে আরম্ভ করল। উষ্ণ নিশ্বাসের মত। পরে এটা ভীষণভাবে দেখা দেবে কিনা জানিনে। উঠতে যখন এসেছি, তখন বিরত হওয়া চলবে না। পদক্ষেপের মাত্রা বাড়িয়ে দিলুম।

পাহাড়ের পথ এসে পড়ল। পরপর পাথর এলোমেলোভাবে সাজানো। অনেক লোক চলা ফেরা করায় মসৃণ হয়েছে তার আকৃতি। অসতর্কভাবে পা ফেললেই জুতো শুদ্ধ গড়িয়ে ফস্‌কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। পাহাড়ের কোন্ তলায় লুটিয়ে পড়তে হবে কে জানে? সতর্কভাবে পা ফেলে এগোতে হল।

শ্রীমতী রায় গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। আর পথ চলা সম্ভব নয়। শরীর তাঁর হয়ে এসেছে ক্লান্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন। দেওকর মূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

উপরে তাকিয়ে দেখি সাবিত্রী মন্দির স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবু আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। এতটা পথ এগিয়ে এসে

আর ফিরে যাওয়া সমীচীন হবে না। বললুম তাঁকে, একটু বিশ্রাম করে নিন, সুস্থ হলেই আবার উঠা যাবে।

তিনি একটা পাথরে বসে পড়লেন। আমরাও অদূরে উপবেশন করলুম। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। আশে পাশের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ঝলমল করছে। পুষ্করের জলে সূর্যকিরণের প্রতিফলন প্রতিভাত হচ্ছে!

একটু পরেই তিনি উঠলেন। আমরা এগিয়ে চললুম। কিছুদূর গিয়েই পড়ল পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ির ধাপগুলো আবার অনেক উঁচু। একটা থেকে আর একটায় উঠতে হলে অনেক কসরৎ করে উঠতে হয়। অল্প কয়টা সিঁড়ি ভাঙ্গলেই দেহে আসে অবসন্নতা। শ্বাস পায় বৃদ্ধি। অভ্যাস না থাকলে এপথ দুরারোহ হয়ে ধরা দেয়। পাণ্ডাজীও গভীরভাবে শ্বাস নিচ্ছেন।

শ্রীমতী রায় আবার অবসন্ন হয়ে পড়লেন। একটা পাথরে আশ্রয় নিয়ে আর একটায় তিনি মাথাটা রাখলেন। অঞ্চল দিয়ে রৌদ্র তাপ নিবারণের জন্য মুখের কিয়দংশ ঢেকে ফেললেন। সারা মুখ চোখ তার কঠোর পরিশ্রমের ফলে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি আবার চলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই তাঁর পা দুটো টলতে লাগল। দেওকর ও আমি তাঁকে সাহায্য করে তাঁর চলবার পথ সুগম করে দিতে লাগলুম। খানিকটা এগিয়েই তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। এবার পরিশ্রম হয়েছে অনেক বেশী। অনেকটা খাড়া পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। সমস্ত দেহ আর ভার বইতে পারছে না।

আমার অবস্থাও অনুরূপ। উপবাস-ক্লিষ্ট দেহটা আর এগোতে চাইছে না। গভীরভাবে শ্বাস বইতে আরম্ভ করছে। উপরে উঠবার

শক্তি যেন ক্রমশঃ লোপ পেতে বসেছে। সমস্ত গা ঘেমে জামা ভিজে যাচ্ছে। বিশ্রাম আমারও খানিকটা দরকার।

উপরে চেয়ে দেখি, শুভ্র শান্ত সাবিত্রী মন্দির আপন মহিমায় ভরপুর হয়ে ভাস্বর সূর্যকিরণে স্নাত। হাতছানি দিয়ে যেন আমাদের আহ্বান করছে। মনের ভিতর একটা সাড়া এল তাতে। এই তীর্থের সঙ্গে পথের এই কষ্টটুকু না থাকলে তীর্থের মহিমা বুঝব কি করে? সহজলভ্য যে তীর্থ তাতে মন-প্রাণ এমন করে তো বসতে চায় না। তাই যাত্রীর দল চলে মরুভূমির তপ্ত বালির উপর দিয়ে, হিমালয়ের তুষার ধবল গিরিশৃঙ্গে, ঘন বনানী ও বিঘ্নসঙ্কুল পথে, যাত্রাপথের শত কষ্ট বরণ করেও। তাদের কষ্টের তুলনায় আমাদের এই সামান্য সাময়িক কষ্ট কত তুচ্ছ, কত কম। অথচ অভ্যাসের অভাবে, দেহের অক্ষমতায়, প্রাণ-প্রাচুর্যের দৈন্যে এইটাই আমাদের কাছে কত কষ্টকর হয়ে দেখা দিয়েছে। সাধনার ভিতর দিয়েই তো সিদ্ধি; কিন্তু সাধনার পথও তো নিরঙ্কুশ নয়। কত দুঃখ-কষ্ট বরণ করে তবে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। তা সে পার্থিব সিদ্ধিই হোক আর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিই হোক। সুখ-দুঃখও তো মানুষের মনেরই একটা বিকার মাত্র। প্রেরণা যখন দুকূল ছাপিয়ে মনটায় ভরপূর হয়ে উঠে, তখন সুখ-দুঃখের ছায়া দুপাশ থেকে সরে যায়। মনের মধ্যে রেখাপাত করতে পারে না। মানুষ হয় তখন দুর্বার, অজেয়, অভীষ্ট সাধনে আত্মহারা।

শ্রীমতী রায় বললেন, দাদা মনে হয় পূর্ব জন্মে হয়ত আপনি আমার আপন দাদাই ছিলেন। নইলে এমন স্নেহ পাব কোথায়!

একটু হেসে বললুম, মানুষের স্মৃতির কোঠাটা বড় নয়, তাই বেশী জিনিস ধরে রাখতে পারে না। পূর্ব জন্মের স্মৃতির বোঝাটা

তাকে বইতে হলে হয়ত ইহজন্মের কোন কথাই তাতে স্থান পেত না। ইহজন্মের অনেক কথাই তার ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ভুলে যেতে হয়। পূর্বজন্মের কোন কথা জানি নে। আপনার স্বামী-পুত্রের কল্যাণ হোক, এই আশীর্বাদই করছি।

একটু বিশ্রাম করে তিনি উঠলেন। আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল। মন্দিরের নিকটে এসে পড়েছি। কিন্তু দুরূহ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। ক্লান্ত দেহ নিয়েই আমি ও দেওকর তাঁকে উঠতে সাহায্য করতে লাগলুম। কম্পমান দেহ নিয়ে তিনি বার বার টলে পড়বার উপক্রম করলেন। আমরা সতর্ক থাকায় কোন বিপদ ঘটল না। অনেক কষ্টে মন্দিরের দ্বার প্রান্তে এসেই তিনি শুয়ে পড়লেন। আমিও অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় একটা পাথরে আশ্রয় নিলুম।

পাণ্ডাজী দরজায় আঘাত করলেন। ভিতর থেকে পূজারী এসে মন্দির দ্বার খুলে দিল। বাললুম, মন্দিরে পূজো তাড়াতাড়ি সেরে নেবেন। নইলে ফেরার পথে গরম বাতাস আরও কষ্ট দেবে।

তিনি মন্দিরের চত্বরে চলে গেলেন। দেওকর পাথরটা সঙ্গে নিয়ে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ নিয়ে আমি চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলুম।

দূরে দেখা যাচ্ছে পুষ্কর তীর্থ ও সহর। চারিদিকে পাহাড়ের চূড়া আর রৌদ্রজ্বল উদ্ভাসিত বালুভূমি। পাহাড়ের নীচে রয়েছে শস্যক্ষেত। তার সবুজ রং চোখে এনে দেয় তৃপ্তির আভাস।

সাবিত্রী পাহাড় বড় নয়। ছোটই। অনুরূপ একটা পাহাড় পাশেই রয়েছে। তার উপর রয়েছে আর একটা মন্দির। পাণ্ডাজী বলেছিলেন, সেটা পাপমোচন দেবের মন্দির।

এই ছোট্ট পাহাড়ের ছোট একটা রাস্তা। সেটুকু উঠতেই হাঁপিয়ে উঠেছি। যুগ যুগ ধরে এসে কত লোক পাহাড়ে পুজো দিয়ে গেছেন। তাঁরা আমার মত ক্লান্ত হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও যে রূপটি দেখলুম, তা তো জীবনে ভরপুর হয়েই রইল। সাবিত্রী মায়ের করুণা ছাড়া এ তো সম্ভবপর নয়। ভক্তিভরে প্রণতি জানিয়ে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

মন্দিরের ভিতরে বা বাইরে কোন ঐহিক ঐশ্বর্যের পরিচয় নেই। শুধু মাত্র সাবিত্রী দেবী ও সরস্বতীর মূর্তি মার্বেল পাথরে গড়া। প্রশান্ত হাস্যবদনা, দেখলেই অন্তর জুড়িয়ে যায়। ভক্তিভরে শ্রদ্ধা জানিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের বাইরে চলে এলুম।

চারিদিকের সৌন্দর্যময় প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে দেবী দর্শনে অন্তরে আনন্দের যে উপলব্ধি হল, সে তো ভুলবার নয়। তীর্থ দর্শনে যে অনাবিল প্রশান্তির উদয় হয়, আজ তারই ক্ষণিকের একটা আভাস সারা অন্তরকে উদ্বেল করে তুলল। জীবনের চলতি পথে থম্‌কে থম্‌কে যে আনন্দের আভাস মানুষের মনে সাড়া জাগিয়ে, তাকে অজানা অচেনা লোকের সন্ধান দিয়ে যায়, সংসারের কোলাহল-ময় পরিবেশে সে উপলব্ধিটুকু চাপা পড়ে যায়। মানুষ তাই পেয়েও পায় না। হয়ত পাবার যোগ্যতা নেই বলেই পায় না। পাওয়াটা তাই জীবন-গতির ফাঁকে এসে তার হাতের মধ্যে এসে আঙুল গলিয়ে পড়ে যায়, চাওয়াটাও খুঁজে পায় না সে কি চায়?

শ্রীমতী রায় পুজো শেষ করে এসে প্রণাম জানালেন। আশীর্বাদ করলুম তাঁকে।

মনে পড়ল, শ্রীমতী রায়ের স্বামী একখানা পত্রে আমাকে অনুরোধ জানিয়ে লিখেছিলেন। তাঁর শ্রীমতীকে এই দুরূহ তীর্থভ্রমণে

নিবৃত্ত করতে। হয়ত দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে শঙ্কাকুল হয়েই তিনি আমাকে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। কিন্তু স্বামী-পুত্রের মঙ্গল কামনায় যাঁর মন-প্রাণ ভরপুর, তাঁকে আমি বাধা দিতে যাই কোন সাহসে? তাঁর স্বামীকে দুরারোগ্য অসুখ থেকে রক্ষা করেছিলেন জগজ্জননী, তিনিই তাঁর রক্ষা ব্যবস্থা করবেন, এই ছিল ভরসা।

ফেরার পথ উঠবার মত কষ্টসাধ্য নয়, তবে বিপদসঙ্কুল। জুতো হাতে নিয়ে সতর্কভাবে আমরা এগোতে লাগলুম। কখনো স্তোত্রপাঠ, কখনো বা গান গেয়ে—নামবার পথ সহজগম্য করে তোলা হল। নীচে তাকানো হল না। তাতে দুর্বল শরীরে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

নির্বিঘ্নে নেমে এসে প্রণাম জানালুম জগজ্জননীকে। বললুম, মা, আজ অন্তর ভরে যে আশীর্বাদের সিঞ্চন দিলে সন্তানকে, তা যেন কেড়ে নিও না। অন্তরের এই আনন্দের আভাস যেন চিরকাল দীপ্যমান রেখো! তোমাকে যেন প্রতি সৌন্দর্যের মধ্যে, নব কিশলয়ে, প্রভাতের অরুণাভায়, জীবনের প্রতি ছন্দেই যেন দেখতে পাই। অন্তরের মধ্যে সে অনুভূতির স্পন্দন, ব্যাকুলতা ও অন্তর্দৃষ্টি সজাগ রেখো। তা হলেই তোমাকে খুঁজে পেতে দেরী হবে না।

পুষ্করতীর্থে ফিরে এসে ব্রহ্মা গায়ত্রী মন্দির দেখলুম। মন্দিরটি বহু পুরাতন। মার্বেল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। মন্দিরের কারুকার্যও সুন্দর। ভিতরে চতুরানন ব্রহ্মাদেব ও গায়ত্রী দেবীর মূর্তি আছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করে বিদায় নিলুম।

বিষ্ণুমন্দিরও দেখলুম। গেটের কাছে শিব ও অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণ মূর্তি। মধ্যে মূল মন্দির। আশেপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির। মূল মন্দিরে রাম, কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার প্রাচীরচিত্র। মন্দিরের সামনে স্বর্ণখচিত স্তম্ভ। স্তম্ভটি মার্বেল ও

লাল পাথরের তৈরী। চারিদিকে গরুড়ের মূর্তি। মন্দিরটি চিত্রবহুল এবং দেব-দেবীর নানা চিত্র অঙ্কিত রয়েছে তাতে। মন্দিরের কারুকার্য চিত্তাকর্ষক।

ভিতরে নারায়ণ মূর্তি। প্রশান্ত বদন। ভগবান বিষ্ণু এখানে ঐশ্বর্যের মধ্যে আত্মসমাহিত আছেন। প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলুম।

চিতোর গড়

আজমীড় থেকে চিতোর গড়ের পথে রওনা হলুম। বহুধা বিস্তৃত শৈলশ্রেণী। বাস একবার তার উপর উঠছে আবার নেমে আসছে। এমনিভাবে উঠা-নামা করতে করতেই পাহাড়ের এলাকা শেষ হল। প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর।

এসে পড়লুম নাসিরাবাদে। ছোট একটা সহর। দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। একটা গির্জা ও তার পাশে একটা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে বাস চলল। ছেলেরা সব দলে দলে স্কুলে যাচ্ছে। শুনলুম প্রবেশিকা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে।

বাস চলল সমতল ভূমির উপর দিয়ে। চারিদিকে আবার মাঠ ধূ ধূ করতে লাগল। গাছপালা নেই বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে দু-চারটে বাবলা গাছ, গুল্ম জাতীয় গাছ আর পত্রবিহীন মনসা জাতীয় গাছ। এর মধ্যেই দেখতে পেলুম ছাগল ও ভেড়ার দল আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। ওরা কি খাচ্ছে জানি না। হয়ত কিছু

শুকনো ঘাস বা গুল্ম জাতীয় গাছ নয়ত আর কিছু। উটও দেখা গেল অনেক। নীরবে নির্বিঘ্নে বাবলা গাছের পাতা চিবুচ্ছে।

বাস এসে পড়ল ভীলবড়া স্টেশনে। এখান থেকে চিতোর ৩৬ মাইল। এটি জেলা সহর। একপ্রান্তে রেল স্টেশন। সহরটা বড় নয়, তবে ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান। এখানে অভ্রের কারখানা ও কাপড়ের মিল রয়েছে। গাছপালার সংখ্যা খুব কম। তাই গরমের মাত্রাটাও একটু বেশী।

ভীলরা স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যবহার বেশ সহজ ও সরল। কানে কুণ্ডল ও পায়ে বালা। জলদানের ক্ষেত্র থেকে জল চেয়ে নিয়ে হাতের তালুতেই সেটা পান করছে।

কয়েকটা কমলা, একটা আমরুল ও এক গ্লাস করে লস্যি খেয়ে আবার রওনা হওয়া গেল।

পথে আবার পাহাড় দেখা যেতে লাগল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে ছোট ছোট কয়েকটা দুর্গও দেখা গেল। তখনকার দিনে সামন্ত নরপতিরা কেল্লাতেই বাস করতেন। শুধু মাত্র নিরাপত্তার দিক দিয়ে নয়, শক্তিমত্তার সহায়ক হিসাবে দুর্গের দান কম ছিল না। এঅঞ্চলে সহর ও গ্রাম অধিকাংশই পাহাড়কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের পাশে যেখানেই জলের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই চলেছে চাষ-বাস। গড়ে উঠেছে পল্লী অথবা সহর।

নদী পার হতে হল কয়েকটা। রাজস্থানের নদীতে জল বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। যেটুকু থাকে সেটুকুও অল্প সময়ের মধ্যেই বালুময় ধরণী শুষে নেয়। সারা বছরই প্রায় শুকনো থাকে। নদীর উপর গাড়ী ঘোড়া চলাচলের জন্য তাই কোন ব্রীজ নির্মাণের আবশ্যকতা থাকে না। শুধু মাত্র পাথর বসিয়ে, কোথাও বা কংক্রীট

জমিয়ে নদীর তলাটা মজবুত করে নেওয়া হয়। এর উপর দিয়েই গাড়ী ঘোড়া স্বচ্ছন্দে এবং বছরের প্রায় সব সময়েই চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু রেলপথের সে উপায় নেই। তাই রেলগাড়ী চলাচলের জন্য সাঁকো তৈরী করতে হয়েছে।

নদীর গর্ভে যেখানেই একটু জল জমেছে, সেখানেই মহা সমারোহে চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক নদীর তলা কঠিন পাথরের তৈরি। তার উপরে রয়েছে কিছুটা জল জমে। এর উপর দিয়েই স্বচ্ছন্দে আমাদের বড় বাসটা চলে গেল। নদীর জলটা অত্যন্ত অগভীর বলেই সেটি সম্ভব হল। রাজস্থানী বন্ধুরা জানালেন, নদীতে কোন সময়েই বেশী জল জমতে পারে না। প্রবল বর্ষাতে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু সেটা সাময়িক মাত্র।

চিতোর গড়ে এসে বাসটা থামল। জেলা সহর এটা, কিন্তু মাঝামাঝি গোছের; দুটো নদী পার হয়ে এসে ঢুকতে হল। একটা নদী শুধু মাত্র পাথরের উপর দিয়েই বয়ে গেছে। চারিদিকে কঠিন পাথর। যেন পাহাড়গুলো কেটেই নদীটার জন্য পথ রচনা করা হয়েছে। দেখতে বড়ই মনোরম। আর একটা সহর সংলগ্ন; তাই একটা ছোট সাঁকো আছে তার উপর।

চিতোর গড় সহরটি চিতোর পাহাড়ের ধারেই। এখান থেকেই বিখ্যাত চিতোর গড় দেখতে যেতে হয় পাহাড়ের উপর। মোটর যাবার রাস্তা আছে, কিন্তু এই বড় বাসটির পক্ষে সে পথ অনুকূল নয়। টাঙ্গা ভাড়া জন প্রতি একটাকা। আমরা সকলে টাঙ্গা ভাড়া করেই পাহাড়ে উঠা সাব্যস্ত করলুম।

দর্শনার্থীর সংখ্যাও হয় প্রচুর। দেখলুম টাঙ্গা করে একপাল ছেলে-

মেয়ে নিয়ে এক রাজস্থানী ভদ্রলোক চলেছেন। সবাই মিলে আরম্ভ করেছেন সঙ্গীতের ছদ্মনামে বিপুল কলরব।

টাঙ্গায় চড়ে পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। অপূর্ব সংস্থান। দুর্ভেদ্য এই দুর্গ। চারিদিকে কেবল পাহাড়। মাঝে পাহাড়ের উপর এই বিশাল দুর্গ। আয়তনে প্রায় সাড়ে সাত মাইল। অনেক গেট পার হয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকতে হয়। দুর্গের দুটো বিশাল প্রাচীর। একটা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেললেও আর একটা প্রাচীর এসে পথ রোধ করবে। গেটগুলো সুদৃঢ়। ভিতরে ও বাইরে সৈন্যদের সংবাদ আদান-প্রদান করবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে সংযোগ পথ। দুর্গের আয়োজন ব্যবস্থা দুর্ভেদ্যতার পরিচিতি জানায়। অথচ এই দুর্ভেদ্য দুর্গও তিন বার শত্রুর পদানত হয়েছে। ফলে শত শত রাজপুত রমনীকে অনলে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। রাজপুত রাজ্যের ইতিহাস যেমন শৌর্যবীর্যের, তেমনি মর্মান্তিক দুঃখ ও করুণায় ভরপুর।

লেফটেনান্ট কর্নেল স্যার উলসলি হেগ রচিত 'কেম্‌ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে চিতোর সম্বন্ধে সুন্দর এক বর্ণনা রয়েছে।—

"Chitor presents to the modern eye the appearance of a vast ironclad in a sea which is represented by the plain from which the fortified hill rises.

চিতোর পাহাড়টা সাড়ে তিন মাইল লম্বা এবং সিকি মাইল চওড়া। এর মাঝখানটা ১২০০ গজ চওড়া এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮৮৯ ফুট উঁচু। চিতোর গড় দুর্গ নীচের সহর থেকে মাত্র পঁচিশ ফুট উঁচু।

পোল বা গেটগুলির নামও সুন্দর। সুরজ গেট, ভৈরব গেট,

হনুমান গেট, গণেশ গেট, রাম গেট, লক্ষ্মণ গেট ইত্যাদি। কোন কোন গেটের পাশে মন্দিরও আছে।

চিতোর গড় এখন ভেঙ্গে চুরে গেছে। চারিদিকের প্রাচীর অনেক স্থানেই এখন ভগ্নস্তূপ হয়ে প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাসাদগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। আমরা সমস্ত গেট পার হয়ে চিতোর প্রাসাদের কাছে এসে পড়লুম। এখানেই টাঙ্গাটা থামল।

সামনে পড়ল নয় লক্ষ ভাণ্ডার। চলতি খরচ মেটাবার জন্য ছিল এই ট্রেজারী। প্রাসাদের উপর থেকে নীচে টাকা নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এই গৃহটি তিনবার আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। ঘরটার জানালা নেই। ভেতরে ঢুকবার জন্য একটি মাত্র দরজা।

চিতোর দুর্গ নবম শতাব্দীর রচনা। পররর্তীকালে দ্বাদশ শতাব্দীতে অনঙ্গ পাল এর সংস্কার সাধন করেন। এর ইতিহাসও বিচিত্র। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আলাউদ্দীন খিলজি প্রথম চিতোর আক্রমণ করেন। চিতোর দুর্গ পতনের ফলে মহারাণী পদ্মিনী জহর ব্রতে আত্মবিসর্জন করেন। দ্বিতীয় আক্রমণ হয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে। বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ জয় করেন। আর একবার জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। রাণা প্রতাপ সিংহের পিতা রাণা উদয় সিংহের রাজত্বকালে চিতোর দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন মোগল সম্রাট আকবর। ঐ সময় আর একবার জহর ব্রত হয়। এই ভাবে কত রমনী যে অনলে আত্মাহুতি দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

দুর্গ রক্ষার ভার নিয়েছিলেন তখন জয়মল্ল। সম্রাট আকবরের বিপুল মোগল বাহিনী বার বার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। সহসা বিস্ফোরণের প্রকোপে দুর্গের প্রাচীরের একাংশ ভেঙ্গে যায়। জয়মল্ল নিজে দাঁড়িয়ে মেরামতের ব্যবস্থা করছিলেন। ঐ সময় স্বয়ং

আকবর দূর থেকে দূর-পাল্লার বন্দুকের গুলিতে তাঁকে নিহত করেন। ঐ রাত্রেই জহর ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কেলোয়ার বীর পাট্টা সিং (পুত্ত) ঐ যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবু দুর্গের পতন ঘটে এবং মোগলদের হাতে তিনি পত্নী ও মাতা সহ নিহত হন। এর পরেই ঘটে সারা চিতোরে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। যার কোন তুলনাই হয় না। ঐতিহাসিক হেগ বলেন,—আকবর চিতোর দুর্গ অধিকার করে প্রায় ত্রিশ হাজার নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করেছিলেন। ("The imperial troops entered the fortress immediately after dawn and Akbar sullied his success by a ghastly massacre. The 8,000 Rajputs who formed the garrison had received much assistance from the peasants numbering 40,000 and a general massacre of both was ordered. Some indeed were spared and made prisoners, but the tale of slain amounted to 30,000."—Vide page 99, Cambridge History of India by Lt. Col. Sir Woolsely Haig.)

চিতোর দুর্গে দেখবার অনেক জিনিস আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, জয়স্তম্ভ, কুম্ভশ্যামজীর মন্দির, মীরা বাঈয়ের মন্দির, কালিকামাতার মন্দির, সমাধিশ্বর শিবের মন্দির, পাতালেশ্বর শিব, জৈন মন্দির; রাজ প্রাসাদসমূহ পদ্মিনী মহল ইত্যাদি।

চিতোর পাহাড়ের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে চিতোর ভূমির দৃশ্য অতি চমৎকারভাবে দেখতে পাওয়া গেল। চারিদিকে পাহাড়। মাঝের পাহাড়ে এই দুর্গ। নীচে জেলা সহরের সুবিন্যস্ত গৃহসমূহ, শ্যামল ভূমি,

নদীর জলরেখা। সবাই মিলে সত্যই আনন্দের অভিষেকে মনকে সিঞ্চিত করে।

নয় লক্ষ ভাণ্ডারের এক পাশে বনবীর দেওয়াল। মনে পড়ল ধাত্রী পান্না আর উদয় সিংহের কাহিনী। নিজের পুত্রকে বিসর্জন দিয়েও শিশু রাণা উদয় সিংহকে বনবীরের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। আজও তাঁর গভীর আত্মদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই পাঠ করে।

বনবীর দেওয়ালটা অর্ধভগ্ন। বনবীর সেটা শেষ করার আগেই উদয় সিংহ তার হাত থেকে চিতোর দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন।

এক স্থানে অনেকগুলি মূর্তির সমাবেশ দেখলুম। অনেকগুলি বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। গ্রীক স্থাপত্যের পরিচিতিও অনেক কারুকার্যে পরিলক্ষিত হল।

দুটো কামান রাখা হয়েছে একটা ঘরে। কামান দুটো খুব প্রাচীন। গাইড জানালেন, বাবরের সঙ্গে রাণা জঙ্গের যুদ্ধের ফলে বাবর পরাজিত হন। ঐ সময় কামান দুটো চিতোর গড়ে আসে। এর একটার নাম 'গর্বভঞ্জন' আর একটার নাম 'শত্রুভঞ্জন'। এটাই নাকি বাবরের প্রথম কামান। এর দৈর্ঘ্য চৌদ্দ ফুট।

পাতালেশ্বর শিব দর্শন হল। সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা নীচে নেমে যেতে হয়। শিবলিঙ্গ মূর্তিটি বহুকালের পুরাতন।

শৃঙ্গার চৌরী দেখলুম। বিষ্ণুমূর্তি। পনের শতাব্দীর মন্দির। পরে পুনর্নিমিত হয়।

ঘোড়ার আস্তাবলটি অপেক্ষাকৃত অক্ষত অবস্থায় আছে। অনেক-গুলো ঘোড়া রাখবার ব্যবস্থা ছিল এখানে।

সূর্যগোখরা বা সূর্য উপাসনার স্থানটি সুন্দর। নহাখানাটিও

পাথরের তৈরী। পদ্মিনীর জহর ব্রতে যাবার পথটা দেখলুম। পুকুর-ঘাটে স্নান করবার জন্য একটা সিঁড়ি পথ রাজপ্রাসাদ থেকে চলে গেছে। এখন আর সেপথে যাওয়া যায় না।—ভেঙ্গেচুরে গেছে। এই পথ দিয়েই অনেকটা গিয়ে পদ্মিনী একস্থানে জহর ব্রতে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। মূল জায়গা দেখবার আর কোন উপায় নেই। সবই ভগ্নস্তূপের আড়ালে। জেনানা মহলটি ভেঙ্গে চূরে গেছে। এক সময় এটা তেতলা ঘর ছিল। সরকার থেকে মেরামতের প্রচেষ্টা চলছে।

দুর্গে ছিল শস্যভাণ্ডার। অনেক বড় ঘর। অনেকটা বড় সুড়ঙ্গের মত। উপর থেকে তার খানিকটা দেখা যায় এখন। অনেক শস্য এখানে সঞ্চয় করে রাখা চলত।

মীরা বাঈয়ের বাস ভবনটি ভেঙ্গে গেছে। মহারাণার প্রাসাদটি দোতলা পাথরের ঘর। এখন ভগ্নস্তূপের সামিল হয়ে পড়েছে।

দেওয়ান-ই-আম দেখলুম। ব্যবস্থা অভিনব। অনেক উচ্চস্থানে থাকতেন রাজা। মাঝের তলার ঘরে সামন্তগণ ও বাইরে প্রজারা এসে তার দর্শন লাভ করত।

সুন্দর একটা জৈন মন্দির দেখলুম। একাদশ শতাব্দীর রচনা। মন্দিরটি অপূর্ব সুন্দর, নানা কারুকার্যময়। পাথরের দেয়ালে নানা নারীমূর্তি খোদিত। সামনে একটা নাট মন্দির। মূল মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা এবং সবই কারুকার্য শোভিত। মন্দিরে তীর্থঙ্করদের মার্বেলের মূর্তি আছে। নানারকম মূল্যবান রত্ন দিয়ে চোখ তৈরী। বেশ জ্বল জ্বল করছে।

মীরা বাঈয়ের মন্দির দেখলুম। মীরা বাঈয়ের উপাস্য দেবতা এখন উদয়পুরে। কারুকার্যময় ছোট মন্দিরটি সুদৃশ্য। শ্রীমতী রায় তন্ময় হয়ে গাইলেন, 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।'

মনে পড়ল মীরা বাঈএর কথা। কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হয়ে, স্বামী, রাজ্য, সুখ, প্রতিষ্ঠা সব বিসর্জন দিয়ে তিনি আকুল হয়ে ছুটেছিলেন। আজ তিনি নেই, কিন্তু আজ তার সাধনার কথা, তাঁর ভজন গীতিতে ভারতের প্রত্যেক লোক শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।

বাপাইয়া সঙ্গে ছিল। বললুম তাকে, এই সেই চিতোর গড়, যার রাণা সৈন্যসামন্ত আর রাণীদের কথা সকলেই পাঠ করে। শৌর্য বীর্য ও আত্মদানের মহিমায় সারা ভারতের লোকই উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধা জানায়। আজ আর সে সব রাণাও নেই, রাণীও নেই। চিতোর গড় হয়ে উঠেছে শ্মশাণতুল্য। কিন্তু এখানে যে মহীয়সী রাণী কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মন প্রাণ তাঁকেই সমর্পণ করেছিলেন। তিনি তো স্থান পেয়েছেন ভারতের প্রত্যেক নরনারীর অন্তরের মণিকোঠায়। আজও তার ভজন শুনলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের হৃদয় আনন্দে, ভক্তিতে, আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠে। কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে বেদনা জানায়।

বাপাইয়া বললে, তা ঠিক, তবে দুটো দু রকম। দুটোকে একই দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা চলবে না। অন্তরের মাপকাঠি দিয়ে অনুভূতির সঙ্গে দুটোকেই বিচার করতে হবে। একটা ভাল বটে। চরম চরিতার্থের প্রকাশ তাও অস্বীকার করছিনে। কিন্তু অপরটাও উপেক্ষার বস্তু নয়।

মীরা বাঈয়ের মন্দিরের পাশে আর একটি মন্দির দেখলুম। রাধাকৃষ্ণ বলরামের মূর্তি আছে। মন্দিরটি নানা কারুকার্য শোভিত এবং আকারেও বড়। বসলেই মনে একটা আনন্দের আভাস আসে।

রাণা কুম্ভ রচিত বিরাট মার্বেল পাথরের তৈরী জয়স্তম্ভটি দেখলুম। অতি সুন্দর এই জয়স্তম্ভ। এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। স্তম্ভগাত্রে দেখলুম দুচারটি স্থানে মূর্তিগুলি ভেঙ্গে চুরে দেওয়া

হয়েছে। সারা জয়স্তম্ভ জুড়েই নানা মূর্তি খোদিত। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, হর-পার্বতী, সরস্বতী ইত্যাদির সুন্দর মূর্তি স্তম্ভের গায়ে খোদিত রয়েছে। উপরের গম্বুজেও মূর্তি শোভিত।

স্তম্ভটি ১২২ ফুট উঁচু, এর নীচের বেড় ৪৭ ফুট ও চূড়ার বেড় ৩৭ ফুট। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে রাণা কুম্ভ এই জয়স্তম্ভ নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

স্তম্ভটির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠলুম। উঠবার পদ্ধতিও অদ্ভূত। কখনো বা উঠ্‌তে হয় ঘুরে ঘুরে, কখনও ঘরের মধ্য দিয়ে যাবার পথ। উঠবার সিঁড়িগুলোও সুন্দর ও বৈচিত্র্যের পরিচায়ক।

আটতলা স্তম্ভ। এর প্রত্যেক তলা থেকে উপরের তলায় উঠবার পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক তলা থেকেই চিতোর দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখা দেয়। সর্বোচ্চ শিখরে উঠে চিতোর দুর্গ, চারিদিকে পাহাড়; নীচের শহর ও শ্যামল প্রান্তরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলুম। উপরে উঠলে মনের মধ্যে একটা জয়ের প্রেরণা জাগায়। অনেক কষ্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠবার পর সাফল্যলাভের দ্যোতক একটা অনুভূতি মনের ভিতর বেশ একটু দোলা দেয়। বোধ হয় মানুষ চায় প্রতিষ্ঠা, জয়স্তম্ভগুলি হয় এই প্রতিষ্ঠার প্রতীক। জানি না, রাজ্যবিজয়ের পর অনুরূপ প্রেরণা রাজাদের মধ্যে এসে পড়েছিল কিনা এবং প্রতিষ্ঠার প্রতীক এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে দাঁড়িয়ে তারা সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন কিনা।

স্তম্ভের অনতি দূরে জহরব্রতের শ্মশাণ। পরাজয়ের গ্লানি বিদূরণের ক্ষেত্র। বীর রাজপুতরা দিতেন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মবলি এবং বীর রাজপুত রমণীরা করতেন অনলে আত্মাহুতি।

সামনে বড় একটা চত্বর। গাইড জানাল, সংগ্রাম সিংহের পত্নী কর্ণাবতী তের শত রাজপুত রমণীসহ এখানে জহরব্রত পালন করেছিলেন। যে গেট দিয়ে তিনি আসেন, সেটি এখন সতী দরজা নামে খ্যাত। এস্থানের কিছুটা অংশ খনন করা হয়েছে। নীচে ছাইয়ের স্তর দেখা গেল। শ্রীমতী রায় তা থেকে কিছুটা তুলে নিয়ে এসে সবার কপালে লাগিয়ে দিলেন।

সমাধিশ্বর মহাদেবের মূর্তি দেখলুম। দ্বাদশ শতাব্দীতেও এই মূর্তি দর্শনের পরিচিতি আছে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্যোতক বিরাট ত্রিমূর্তি। সৃষ্টির মূর্তিতে সস্মিত বদন। স্থিতি-বিগ্রহ বরাভয় প্রদান মূলক ও প্রশান্ত বদন এবং ধ্বংস মূর্তি দংষ্ট্রা করাল বদন। পাহাড়ের গায়ে তিনটি বিপুলকায় আনন পাশাপাশি খোদিত আছে। বহু পুরাতন এই মূর্তিত্রয় এখনও সুন্দর ও অক্ষত রয়েছে।

এর কাছেই গোমুখেশ্বর পুকুর। পাহাড়ের উপর থেকে স্বতঃ-উৎসারিত। ছটো ঝরণার মুখ থেকে জল পড়ছে। একটার নীচে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। এই ঝরণার জল জমা হচ্ছে পুকুরে। খানিকটা জল পান করলুম। খুব সুস্বাদু। চিতোর তুর্গে এখনো অনেক লোক বাস করেন। এঁরা এখান থেকেই পানীয় জল নিয়ে যান। গাইড জানাল, পদ্মিনী নিত্য এই পুকুরে এসে স্নান করতেন।

পুকুরের পাশে আর একটি ছোট জৈন মন্দির আছে। এটি দেখতে খুব ছোট তবে সুন্দর। এর কাছে বীর পুরুষদের স্মারক চিহ্ন হিসাবে তৈরী একটা পাথরের ঘর দেখলুম। তার সঙ্গে একটা গোল বারান্দা।

চিতোর তুর্গের মধ্যে অনেকগুলি পুকুর আছে। বেশীর ভাগই

শুকিয়ে গেছে। হাতী স্নান করানোর পুকুরটা হাতী পুকুর নামেই খ্যাত। জল এখন তাতে মোটেই নেই। পিঁপড়েরা পর্যন্ত ডোবার ভয় করে না। জয়মল্ল ও পাট্টার স্মৃতি পুকুরে কিছুটা জল দেখতে পাওয়া গেল।

পদ্মিনী মহল দেখলুম। দুর্গের এক প্রান্তে এই মহল। প্রথমেই পড়ে দাসী মহল, ছোট ছোট ঘর। এসব ডিঙ্গিয়ে গেলে দেখা যায় আর এক মহল। এখান থেকেই আলাউদ্দীন খিলজি পদ্মিনীকে দেখতে পেয়েছিলেন আয়নায়।

দেখবার পদ্ধতিটুকুও অভিনব। এই প্রাসাদের পাশেই একটা পুকুর। সেই পুকুরের মধ্যে রয়েছে আর একটা প্রাসাদ, তাকে বলা হয় জলমহল। প্রাসাদের নীচে ছোট একটা বারান্দা এবং সেখান থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি একেবারে পুকুরের জল অবধি। জলমহল প্রাসাদটি পুকুরের অপর প্রান্তের মূল প্রাসাদটির অনেক নীচে অবস্থিত। সুতরাং জলমহল প্রাসাদের সিঁড়ির পাশে বারান্দায় কেউ এসে দাঁড়ালে দূরস্থিত মূল প্রাসাদের জানালার ভিতর দিয়ে তার প্রতিবিম্ব এসে পড়বে, মূল প্রাসাদের দেয়ালে আয়নার ভিতর। তাই আয়নার নীচে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকালে শুধুমাত্র প্রতিবিম্বই দেখা যাবে; মানুষকে দেখা যাবে না। মানুষকে দেখতে হলে আরও খানিকটা এগিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। আয়নার ভিতর আমরা সিড়ি ও বারান্দার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলুম। মূল বারান্দা ও সিঁড়ি দেখতে পেয়েছিলুম আরও এগিয়ে দরজার পাশে গিয়ে। গাইড জানাল, পদ্মিনী এসে ঐ সিঁড়ির পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খিলজী তাই পদ্মিনীর ছায়াকেই দেখতে পেয়েছিলেন, পদ্মিনীকে দেখতে পাননি।

পদ্মিনী মহল এখনও যত্নের সঙ্গে রক্ষিত হচ্ছে। এর অনতি দূরে প্যারেড গ্রাউণ্ড ও সামন্ত নৃপতিদের গৃহের ভগ্নস্তূপ।

পদ্মিনী মহল থেকে এলুম মহাকালী দর্শনে। কালিকামাতার মন্দির বহু পুরাতন। অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত। কালীমাতা চিতোরের জাগ্রতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 'ময় ভূখাঁ হুঁ" এই রবে স্বয়ং তিনি আবির্ভূতা হন এবং চিতোর দুর্গবাসীকে বিহ্বল করে তোলেন।

মন্দিরে মহাকালী ও শ্রীদূর্গা মূর্তি। মহাকালীর মূর্তি কাল পাথরের ও শ্রীদূর্গা মূর্তি মার্বেল পাথরের তৈরী। মন্দির সুন্দর। চূড়া সুউচ্চ ও সুদৃশ্য। মন্দিরের সামনে একটা চত্বর।

মন্দিরে ঢুকে একটা অজানা আনন্দে মন ভরে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখি প্রশান্তবদনা মাতা সস্মিত নয়না। শতাব্দীর উপর শতাব্দী ধরে তিনি স্থিরভাবে চিতোরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ সাক্ষী-স্বরূপা হয়ে বিরাজ করছেন।

চিতোরের সব চলে গেছে। শুধুমাত্র মন্দিরগুলোতে এখনও নিত্যপূজা চলছে; ভক্তের সমাগমও কম নয়। মন্দিরের মাঝে দাঁড়িয়ে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম মায়ের দিকে, নিরুপায় সন্তানের মত। কেমন যেন স্নেহের সুধা ক্ষরিত হচ্ছে সস্মিত নয়ন থেকে। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিণীর সে কি অপূর্ব রূপ। সমস্ত অন্তর যেন উজাড় হয়ে পড়ল তাঁর চরণে। তুমি নিত্য, তুমি সত্য, তুমি চিন্ময়ী, মৃন্ময়ী সব, তাই তুমি আছ। শুধু এই মন্দিরেই নয়, সমস্ত মানুষের অন্তরে, ভূধর, সাগরে, আকাশের নীলিমায়, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র। সর্বশক্তির আধার তুমি মা, সর্বগুণের আকর তুমি, তাই তোমায় দেখতে পাই সৌন্দর্যের উৎসে, হৃদয় বেগের কমনীয়তায়, প্রকৃতির নিত্য নতুন রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শের সঞ্চারে।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি শুধু চিতোরের নও, তুমি বিশ্বজননী। তাই তোমায় জানাই অন্তর দিয়ে ভক্তির অর্ঘ্য।—

'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং,
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেস বন্দ্যা ভবতী-ভবন্তি,
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তি নম্রাঃ॥'

উদয়পুর

চিতোরগড় থেকে রওনা হলুম উদয়পুরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড়গুলো অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে বাস চলতে লাগল পূর্ণবেগে। রাত প্রায় দশটায় উদয়পুর এসে উপস্থিত হলুম।

ফতে মেমোরিয়ালে এসে আশ্রয় নিলুম। এখানে বাসস্থানের জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। ভাড়া পাঁচ টাকা ও তিন টাকা হিসাবে। ঘরের সঙ্গে থাকে বাথরুম ও পায়খানা। ব্যবস্থা ভাল। আহারের ব্যবস্থা অন্যত্র। রুটি তরকারী ও দুধ, রাতে এই তিনটি আহার্য গ্রহণ করেই ফিরে এলুম। তরকারী যা ঝাল! কোন মতে গলাধঃকরণ করে উঠে আসতে হয়েছিল। ঠোঁট দুটো পর্যন্ত জ্বালা করতে লাগল সে ঝালে।

ফতে মেমোরিয়াল গৃহটি সুন্দর। উপরে একটা ক্লক টাওয়ার আছে। সামনের বারান্দায় তিনটি মূর্তি। একটি রাজস্থানের গৌরব-বীর্য ও শৌর্যের প্রতীক রাণা প্রতাপ সিংহের ও অপর দুটি রাণা ফতে সিংহ এবং রাণা ভূপাল সিংহের।

শহরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। উদয়পুরকে হ্রদের শহর বলা হয়। চারিদিকে বড় বড় হ্রদের সমষ্টি। এর একটার সঙ্গে আর একটার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। হ্রদগুলি প্রায় সাত মাইল স্থান জুড়ে রয়েছে।

ফতে সাগর দেখলুম পরদিন প্রাতঃকালে। বিরাট একটা হ্রদ এবং সৌন্দর্যে অতুলনীয়। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। এক ধার বাঁধানো এবং তার পাশ দিয়েই মোটর চলবার জন্য পীচের রাস্তা। মানুষ চলবার জন্য হ্রদ ঘেঁষে উঁচু বাঁধানো পথ। রাস্তার নীচে আমের বাগান। তাতে ধরে রয়েছে অজস্র মুকুল, বায়ুভরে ভেসে আসছে তার সুমিষ্ট গন্ধ। উদয়পুর সহরের অনেকটা বেষ্টন করে রয়েছ এই ফতে সাগর।

হ্রদের মাঝে কৃত্রিম দ্বীপ। একটায় দেখলুম ফলের বাগান আর একটায় ফুটে রয়েছে অজস্র ফুল। হ্রদ খুব গভীর, এর একপাশে রয়েছে জল সেচনের ব্যবস্থা।

ফতে সাগরের অনতি দূরে সেহলী বাস। ফোয়ারা ও ফুলের সমাবেশ সেখানে। দেখবার স্থান বটে। ফোয়ারা থেকে বৃষ্টিকণার মত জল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে চারটি পাথরের হাতী উদ্যানের শোভা বর্ধন করছে। নানারকম মরশুমী ফুল ফুটে একটা রংয়ের মেলা বসিয়েছে সেখানে।

বাসে চড়ে ডাবোক রওনা হলুম। পাহাড়ের উপর দিয়ে বাস

চলল। পথে পড়ল দীর্ঘ একটা টানেল। পাহাড়ের এই সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়ে রেলপথ চলে গেছে। তার উপর দিয়ে মোটর চলবার পথ। এর কাছেই উদয় সাগর রেলস্টেশন। উদয় সাগরটি রেলস্টেশন থেকে খানিকটা দূরেই। এটা শহরের একপ্রান্তে, এবং আয়তনে বিশাল।

ডাবোক জনতা কলেজ দেখলুম। এই কলেজ ভবনটি এর আগে কর্নেল টডের বাসস্থান ছিল। ইনি রাজস্থানের প্রামাণ্য ইতিহাস প্রণেতা হিসাবে বিখ্যাত।

জনতা কলেজটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। গ্রামের লোকদের জন্য সামাজিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র এটি। এঁরা পঞ্চায়েতের সম্পাদকগণেরও শিক্ষার ভার নিয়েছেন। রাজস্থানের এই শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রটি বিদ্যাভবন শিক্ষাকেন্দ্রের শাখা বিশেষ। বিদ্যাভবন কর্তৃপক্ষ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে সুন্দর একটি নার্শারী স্কুল, সামাজিক শিক্ষা সংগঠকদের শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রভৃতির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকার থেকে এঁরা নানা রকম সাহায্য পেয়ে থাকেন। বৈকালে পিচৌলা হ্রদে গেলুম। হ্রদটি রাজ প্রাসাদের গা ঘেঁষে চলে গেছে এবং শহরের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে। উদয়পুরে অনেকগুলো হ্রদ আছে, তার মধ্যে ফতেসাগর পিচৌলা, রংসাগর স্বরূপসাগর ইত্যাদি বিখ্যাত। এর একটার সঙ্গে আর একটার যোগ রয়েছে। পিচৌলা শব্দটির অর্থ পিছনে। রাজপ্রাসাদের পিছনে বলে এই নামকরণ হয়েছে। এই হ্রদে নৌকা ভাড়া করে বেড়ানো যায়। আমরা সবাই মিলে দুটো নৌকা ভাড়া করে হ্রদে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

চারিদিক পাহাড় বেষ্টিত। মাঝে এই সব হ্রদ। জল গভীর ও কাক চক্ষুর মত। মাঝে মাঝে রয়েছে কৃত্রিম দ্বীপ। দ্বীপগুলিতে গাছপালা, বাগান, প্রাসাদ, ঘরবাড়ী, মন্দির সবই আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যও তাই অতি সুন্দর দেখায়।

হ্রদের মাঝে রয়েছে স্মৃতি মন্দির। এই স্মৃতি মন্দির রচনায় একটা করুণ কাহিনী জড়িত রয়েছে। মহারাণার দরবারে এক রমণী আসেন নানা রকম বৈচিত্রামূলক ক্রীড়া প্রদর্শন করতে। কথায় কথায় প্রকাশ করেন তিনি; এই পিচৌলা হ্রদের দুই দিকের দুই পাহাড়ের শীর্ষদেশে যদি কোন দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে তিনি তার উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে পার হয়ে যাবেন। এই দুরূহকার্য সম্পাদন করতে পারলে একটা কঠিন সর্ত পালন করতে হবে মহারাণার।

সকলে অবাক হল এ কথা শুনে। এরূপ অসম্ভব ও অবিশাস্য কার্য কিরূপে এই রমণী সম্পাদন করবেন, তা তাঁরা ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না। হ্রদটি পার হতে অন্ততঃ আধমাইল হেঁটে যেতে হবে শূন্যে দড়ির উপর দিয়ে, বাতাসের বেগও আছে। তাছাড়া এই সুদীর্ঘ উচ্চপথে ভারসাম্য বজায় রাখা একরকম অসম্ভব। সবাই হেসে উড়িয়ে দিলেন একথা। মহারাণা রাজী হলেন তার সর্তে। কেউ তাতে বাধাও দিল না। সবারই ধারণা, সাত মণ তেলও একরাতে পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।

সমস্ত আয়োজন হবার পর নির্দিষ্ট দিনে দর্শকদের ভীত-স্পন্দিত অপেক্ষমান দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে উচ্চস্থিত দড়ির উপর

দিয়ে রমণী অগ্রসর হলেন। একটুকুও পা টলল না। স্বচ্ছন্দ গতি তার। সকলে অবাক হয়ে তার এই অসম্ভব প্রচেষ্টার সার্থকতা কম্পিত হৃদয়ে দেখতে লাগল। মহারাণা বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে। অর্ধপথ স্বচ্ছন্দ গতিতে অতিক্রম করল রমণী। অনেক উঁচুতে ঝুলছে দড়ি, দুলছে পায়ের তলায়। ফস্কে গেলেই পড়ে যেতে হবে বহু নীচে নদীর গর্ভে। তাতে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার। আপন মনে দৃঢ়পদে দুলতে দুলতে চলেছে রমণী সেই সুউচ্চ শূন্য পথ দিয়ে, দড়ির দোলনায়। পথ প্রায় শেষ হয়ে এল। সাফল্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই রইল না। মহারাণা হতবাক হয়ে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হলেন।

মহারাণার অন্তরঙ্গ হিতৈষীরা প্রমাদ গণলেন এতে। যে সর্ত আরোপ করা হয়েছ, তা মহারাণার পক্ষে পালন করা অসম্ভব। অথচ মহারাণা তা পালন করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। রাজ্যে ঘটবে সমূহ বিপদ। আশঙ্কা উত্তেজনায় অধীর হয়ে এদের একজন গোপন ভাবে দড়ির একপ্রান্ত কেটে দিলেন। রমণী আর এগোতে পারলেন না। এই হীন চক্রান্তের ফলে পথ সমাপ্তি না হতেই তিনি হ্রদের গভীর জলে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

মহারাণা মনে অত্যন্ত আঘাত পেলেন এতে। পরবর্তী কালে নির্মাণ করা হল এই স্মৃতি মন্দির। করুণ কাহিনীর বেদনায় ভরা এই মন্দির আজও দর্শকদের মনে বেদনা জাগায়।

বোট চালক সালঙ্কারে এই কাহিনী আমাদের শুনিয়েছিল। কাহিনী তার শাখা প্রশাখায় পল্লবিত, কিন্তু মূল ঘটনা একই রূপ। স্মৃতি মন্দিরটিও তাই বেদনার মূর্ত প্রতীক হয়েই ব্যথা জানায়।

জগ মন্দির ও জলমহল দেখলুম। গভীর জলের মধ্যে তৈরী এই

প্রাসাদ দুটি। একটিকে শীষমহলও বলা চলে। অসংখ্য কাচের আসবাবপত্রে বোঝাই। চেয়ার, টেবিল, আলমারী সবই পুরু কাচের তৈরী। ঘরের মধ্যে নানা চিত্র কার্য। উপরের ঘরে উঠলে চারিদিকের দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর দেখায়।

দোতলায় দেখলুম যশোদা ও কৃষ্ণের তৈলচিত্র। এমন সুন্দর সে ছবি যে, যেখানেই দাঁড়িয়ে থাকা যাক না কেন, বালক কৃষ্ণকে দেখা যাবে মৃদু হাস্যরত। মহারাণীর মহলেও নানারূপ দেয়াল চিত্রণ ও কাচের কাজ। টেবিলের উপর সুন্দর দাবা খেলার ছক দেখতে পাওয়া গেল।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে ছোট একটা ফলের বাগান আছে। তাতে আম ও কলাগাছ লাগানো রয়েছে।

আসবাবপত্র ও উপকরণ সবই ভোগবিলাসের অনুকূল। প্রাসাদ দুটিও তাই আরাম নিকেতনের অংশ বিশেষ।

বোটে হ্রদ পরিভ্রমণ করতে লাগলুম। একটা দ্বীপে রাণীমাতার কিষণজীর মন্দির। হ্রদের মাঝখানে একটা সুদৃশ্য গৃহও দেখলুম। বোট চালক জানাল, রাজা রাণীরা এখানে পিকনিকের ব্যবস্থা করতেন।

উদয়পুরে এসে নৌকা ভ্রমণ না করলে ভ্রমণটা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা পিচোলা হ্রদ পেরিয়ে ক্রমশঃ রং সাগরে এসে পৌছলুম, চারিদিকে তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে। একদিকে মঙ্গল আরতি কাঁসর ঘন্টার সুমধুর সুর পিচোলা হ্রদের উপর দিয়ে ভেসে এল, আর একদিকে দেখা গেল শান্ত সমাহিত পর্বত। একদিকে ভক্তির উচ্ছ্বাস আর একদিকে সমাধির ধ্যানমগ্নতা। একদিকে হৃদয়ের আকুলতা, অপর দিকে প্রশান্তি। পিচোলা যেন এ দুটোর সংযোগস্থল। তাই এ দুটিকে কেন্দ্র করে যে দুটি রূপের পরিচয় পেলুম, মনের ভেতর

সেটা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রইল। সুউচ্চ পর্বতের মাঝখানে বিরাট হ্রদ, চারিদিকের বিপুল পাহাড়ের বেষ্টনী, শান্ত-স্নিগ্ধ সুনির্মল হ্রদের জল, মৃদুমন্দ বায়ু, উপরে নক্ষত্র খচিত বিশাল মহাকাশ, দেবালয় থেকে ভেসে আসা কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি ও স্তোত্রের সুর, আকাশের তৃতীয়ার ক্ষীয়মানা ম্লান চাঁদের রূপালী আলো সমস্ত পরিবেশটাকে এমন স্বপ্ন-মধুর করে তুলল, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়।

মিশ্র একটা ভজন গাইল। শ্রীমতী মেহতাও তাতে গুণ গুণ করে সুর সংযোজনা করতে লাগলেন। আমাদের অপর বোটটা একটু দূরে সরে গেছে। সেখানেও শ্রীমতী রায় সঙ্গীত আরম্ভ করেছেন। তার সুরও ভেসে আসছে।

একটা ব্রীজের তলা দিয়ে রং সাগরে পৌঁছানো গেল। বাজারের সংলগ্ন এই হ্রদ। দূরের কাঁসরঘণ্টার সুর তখন মিলিয়ে গেছে। হ্রদের ধারে ঘরে ঘরে তখন ইলেকট্রিক আলো তীব্র ভাবে জ্বলছে। বাজারের কলরোল আমাদের কানে এসে পৌঁছল।

সহসা তীব্রশব্দে চমকিত হলুম। চারিদিক থেকে ভেসে উঠল মাইকের প্রচণ্ড নিনাদ। যেন সাইরেনের তীব্র সুর। অনেকগুলো মাইক একসঙ্গে ছাড়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে চলেছে গ্রামোফোনের গানের অপূর্ব সংমিশ্রণ। গান বা সুর কোনটাই বোঝবার উপায় নেই। শুধু একটা প্রচণ্ড কলরোল সঙ্গীতের অপলাপে, যন্ত্রের প্রাখর্যে বার বার এসে কানের ভিতর আঘাত হানছে। এতো শুধু সঙ্গীতের অপমৃত্যু নয়, আধুনিক রুচির বাস্তবতার কঠোর ইঙ্গিত। মাইকের কোরাস যে কি বস্তু তা বলবার জন্য ব্যাপ্তির প্রয়োজন নেই।

রং সাগর ছাড়িয়ে স্বরূপ সাগরে এসে পৌঁছলুম। খানিকটা

চলবার পর সে প্রচণ্ড কলস্বর আর কানে এল না। এখানে গভীর নিস্তব্ধতা। শুধু মাত্র বোট চলাচলের ছপ-ছপ শব্দ। রাত হয়েছে অনেক। একটা গভীর নিস্তব্ধতার ভাব সারা হ্রদটাকে আছন্ন করে রেখেছে। এও এক মধুর রূপ। এই নিস্তব্ধতায় প্রাণে সাড়া জাগায় আকাশের তারা; ধ্যানমগ্ন পাহাড় আর শান্ত হ্রদ। অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করলে অন্তরে যে পুলকের সৃষ্টি হয়, মনটা যে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, প্রেমে ভরপূর হয়ে উঠে—বেঁচে থাকবার জন্য তার দামও কম নয়।

ফিরে আসবার পথে শ্রমজীবি কলেজ দেখলুম। দিনে যাঁরা অফিসে বা অন্য কোথাও কাজ করেন, রাতে তাঁরা এসে এখানে পড়বার সুযোগ পান। বি, এ, পর্যন্ত পড়বার ব্যবস্থা আছে এই কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত এই কলেজ। কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন, উত্তর ভারতে এটাই একমাত্র এই ধরণের শিক্ষায়তন, তবে অন্যত্র এরূপ কলেজ খুলবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

পথে দেখলুম, একটা বিয়ের প্রসেশন। বর চলেছেন ঘোড়ায় চড়ে। লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর একজন। বরযাত্রীরা রং-বেরঙের নানারকম পোষাক পরে হেঁটেই চলেছেন। পিছনে সমবেত সঙ্গীত করে মহিলারা যাচ্ছেন। এঁদের অধিকাংশের পরনে ঘাগরা, ব্লাউজ ও ওড়না। গায়ে মাথায় হাতে অসংখ্য অলঙ্কার। হাতের চুড়িগুলি হাতটার অধিকাংশই দখল করে নিয়েছে। শ্রীমতী রায় ও শ্রীমতী চ্যাটার্জী এঁদের সঙ্গে আলাপ করে এসে জানালেন, বড়ই সরল আর সুমধুর ব্যবহার এঁদের।

উদয়পুরে বহু মন্দির। এর মধ্যে জগদীশ মন্দিরই বড় ও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরদিন জগদীশ মন্দির দেখলুম। এখানেই

সাধিকা মীরাবাঈ-এর ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি আছে। মন্দিরটি নানা কারুকার্য শোভিত। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দিরে উঠতে হয়। মন্দিরে মীরা বাঈএর কৃষ্ণমূর্তি ও মহালক্ষ্মী এবং মহা সরস্বতী মূর্তিও দেখলুম। মূর্তিগুলি খুব সুন্দর এবং দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

সাধিকা মীরাবাঈএর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি। এই সেই মূর্তি, যার জন্য মীরাবাঈ আত্মহারা হয়ে দিন কাটিয়েছেন। চিতোরে দেখলুম মন্দির আর এখানে দেখলুম ঠাকুর। মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। যাত্রাপথে কতবার মনে উদয় হয়েছে, উদয়পুরে এ ঠাকুর দেখব। কিন্তু উদয়পুরে এসে কোথায় রয়েছেন ঠাকুর! তার হদিস প্রথমটা পাইনি। বহু লোককে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু কেউ সদুত্তর দিতে পারেনি। রাজস্থানী একজন বন্ধু জানালেন, সে মূর্তি দেখবার উপায় নেই, মহারাণীর প্রাসাদে রয়েছে। তবু যেন কেমন আকাঙ্ক্ষা হল, মূর্তি দেখবার সুযোগ নিতেই হবে। অথচ কিভাবে দেখব ভেবে ঠিক করতে পারিনি। জগদীশ মন্দিরে উঠে দেবদেবীকে প্রণাম জানাচ্ছি। তখন সহসা পূজারী জানালেন, আপনি মীরা বাঈএর শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দেখতে চেয়েছিলেন, এই সেই মীরা বাঈএর ঠাকুর। চমকে উঠলুম একথায়। কই, মীরা বাঈএর ঠাকুর দেখবার জন্য আমার অন্তরের আকুলতা আমি পূজারীকে তো জানাইনি। তাকে কিছু জিজ্ঞাসাও করিনি। বন্ধু বান্ধবেরা যারা জানেন, তাঁরাও একথা প্রকাশ করেননি বলে মনে হয়। সহসা অযাচিত ভাবে অভাবিত এই বার্তা পূজারীর মুখ দিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছল কি করে? হতভম্বের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। অন্তর্যামীদেব! তুমি কি মানুষের মনের বেদনা বুঝতে পার, তাই কি তোমার এই করুণা। ভাল করে দেখতে পাব সে সুযোগ ও সুবিধা

তুমি আমাকে দাওনি; পিছনের ডাকে আবার এখনি আমাকে ফিরে যেতে হবে সুদূরে। তাই ক্ষণিকের যে দেখা পেলুম, তাই যেন চিরকালের পাথেয় হয়ে থাকে। আনন্দের অভিষেকে তাই তোমার বরণ করি।

মহা লক্ষ্মী ও মহা সরস্বতীর দিকে চেয়ে রইলুম। মধুর মূর্তি। প্রসন্ন বদনা ও সস্মিত নয়না। হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কল্যাণহস্ত প্রসারিত কর মা, সমস্ত জগৎ ধন্য হোক তোমার মঙ্গল হস্তের স্পর্শে। হৃদয়ের অনবদ্য আকুতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

ফেরবার পথে গোলাপ বাগ দেখলুম। চারিদিকে ফল ও ফুলের বাগান। মরশুমী ফুল থরে থরে সজ্জিত। এর একদিকে রয়েছে ছোট একটা চিড়িয়াখানা। কয়েকটা সিংহ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে, এদের প্রত্যেকটির জন্য আছে একটা ঘর ও তার সঙ্গে ছোট একটা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে স্বচ্ছন্দে চলাফেরার ব্যবস্থা আছে কিন্তু পালিয়ে যাবার পথ নেই। উঁচু মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। বাঘ সিংহগুলিকে বেশ সতেজ দেখলুম। কৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশ এদের স্বচ্ছন্দ গতির খানিকটা অনুকূল অবস্থার পরিপোষক। কয়েকটা বড় হায়েনা, নেকড়ে, নীল গাইও দেখতে পাওয়া গেল। চিড়িখানাটি ছোট এবং বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নেই।

উদয়পুর শহরকে বলা হয় প্রাচ্যের ভেনিস। শহর খুব বড়ও নয়। শহরের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে লেক আর পাহাড়। রাস্তাগুলি প্রশস্ত নয়, তবে নতুন এলাকার রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সব সুন্দর। শহর ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং অনেক বাড়ীঘর আধুনিক ভাবে গড়ে উঠছে।

উদয়পুর শহর সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। দিগন্তব্যাপী শৈল-

শ্রেণীর সমারোহ ঢেউএর প্রবাহের মত সুদূর বিস্তৃত, হ্রদ সমষ্টির বিপুলায়তের সৌন্দর্য অনবদ্য, মর্মর রাজপ্রাসাদ, সুউচ্চ মন্দিরের চূড়া, সুরম্য উদ্যান সবাই মিলে সৌন্দর্যের এই লীলা ভূমিকে এক অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করে তুলেছে। আধুনিক নগর স্থাপত্য সেই সৌন্দর্যের পরিপোষক হয়ে শহরটিকে আরও রমণীয় করে তুলেছে।

রাজসমুন্দ ও রাজস্থানের শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ

উদয়পুর থেকে রওনা হলুম রাজ সমুন্দে। বাস চলতে লাগল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। ক্রমশঃ দুর্গম পাহাড় এসে পড়ল। কখনো সরু রাজপথে প্রচণ্ড শব্দ করে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। কখনো সর্পগতিতে পাহাড়ের আঁকা বাঁকা পথে চলতে লাগল। চারিদিকে পাহাড়ের শ্রেণী, ঢেউএর পর ঢেউ খেলে চলেছে পাহাড়। এই ঢেউএর যেন বিরাম নেই। এ যেন একটা পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছি, তাই ঢেউ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে চলেছে বাস, তরঙ্গমান সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটা ডিঙ্গি নৌকার মত।

পাহাড়, নিকষকাল কঠিন পাহাড়। চারিদিকে কেবল পাহাড়ের রাজত্ব। কদাচিত লালচে বা সাদা পাথরও দেখতে পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সমস্তটাই যেন কাল পাথরের রাজত্ব। এক একটার আকৃতিও কম নয়।

নীচে চেয়ে দেখলুম, পাহাড়ের সানুদেশে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট শ্যামল প্রান্তর, পাহাড়ের বুক চেরা জলে। কঠিনে কোমলে রুক্ষতা ও স্নিগ্ধতার অপূর্ব সংমিশ্রণ।

এমনি পাথরের বাঁধন ঘেরা পথে একটা গেটের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পুলিশ চৌকি সেখানে। বাসটা থামল।

চারিদিকে চেয়ে দেখি উদয়পুরের পাহাড় ঘেরা ঐশ্বর্য। এই শৈলশ্রেণী এনে দিয়েছে রাজপুত জাতির শৌর্য বীর্যের গরিমা, স্নেহময়ী মাতার মত রক্ষা করেছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে। রাজপুত জাতির ঐতিহাসিক বীর্যবত্তার পরিচিতিতে এই পাহাড়ের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। প্রকৃতির রুক্ষতায় রাজপুতজাতির চিত্ত হয়েছে কুলিশ কঠিন, শরীরে এনে দিয়েছে শক্তিমত্তা, মনে দিয়েছে অদম্য সাহস। স্বাধীনতার লিপ্সা জাগিয়েছে প্রেরণা। তাই বার বার মোগল শক্তি প্রতিহত হয়েছে এই পাহাড়ের গিরিপথে। হলদিঘাটের গিরিবর্ত্ম এই পাহাড়ের অনতি দূরে। রাণা প্রতাপসিংহের মুষ্টিমেয় সৈন্য প্রতিহত করেছিল বিপুল মোগল সৈন্যকে এই গিরিবর্ত্মেই। এ ছিল গ্রীকবীর লিওনিদাসের, পারস্যরাজ জারাক্সেসের অভিযান প্রতিহত করবার অনুরূপ অবদান। ইতিহাসের এ কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে দীপ্তিমান। আজও হলদিঘাটে প্রিয় অশ্ব চৈতকের সমাধি সে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আসছে।

কৈলাস পুরীতে এসে পৌঁছলুম। এ হিমালয়ের কৈলাস ধাম নয়, যে শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ও দুর্গম পাহাড়ে মহাদেব বিরাজ করেন, সে কৈলাস পর্বত নয়। এ পাহাড় আরাবল্লী পর্বতমালার একটা সুউচ্চ অংশ। রাণা উদয় সিংহ নির্মাণ করেছেন এই কৈলাসপুরী। বহু মন্দির শোভিত এই কৈলাসপুরী। মন্দিরের চূড়াগুলিও

নানা কারুকার্যে ভরা। ছোট বড় একশ আটটি মন্দির আছে এখানে।

ভগবান একলিঙ্গ দেবের মূর্তি দর্শন করলুম। শিবলিঙ্গে মহাদেবের পাঁচটি আনন খোদিত করা রয়েছে। রাজস্থানের এটি একটি মহা তীর্থস্থান। এই প্রাচীন মন্দিরে বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। প্রশান্ত বদন পঞ্চানন মহাদেবের মূর্তি কষ্টিপাথরে গড়া। নয়নাভিরাম মূর্তি। কিছু ফুল কিনে নিয়ে গেছলুম। মহাদেবের অর্ঘ দেবার জন্য পূজারীর হাতে দিলুম। দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানালুম। হে বাণেশ্বর, জ্ঞানামৃত প্রদায়ক, নরকার্ণবতার, দারিদ্র্য-দুঃখ দহনকারী শিব; সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধিকর্তা তুমি মঙ্গলময় হয়ে করুণা বিতরণ কর, আত্মার আকুতি তোমাকে স্পর্শ করুক। আশুতোষ! অল্পেই তুমি হও ভক্তবৎসল, অপার করুণা তোমার ঝরে পড়ে, তোমার মঙ্গল আশীষে দেশের কল্যাণ হোক।

মহাকালী, পার্বতী, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবীর মন্দিরও আছে। এর কোনটা কাল পাথরের, কোনটা মার্বেল পাথরের। সবাইকে নতি জানালুম।

মন্দিরের অনতিদূরে পর্বত শীর্ষে একটা বিরাট দীঘি আছে। একে বলা হয় ইন্দ্র সরোবর। দীঘিটার চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা এবং তার দৃশ্যও মনোরম।

বাসে ফিরে এলুম সবাই। বাস আবার চলল নাথদ্বারের দিকে। আবার চলা আরম্ভ হল পাহাড়ী পথে। চারিদিকের পাহাড়ের দৃশ্য নয়নাভিরাম হয়ে দেখা দিল। যাঁরা পাহাড় নিত্যই দেখেন, তাঁদের পক্ষে পাহাড়ের দৃশ্যটা নব নব ভাবে উদয় হয় কিনা জানিনে, আমি সমতট বাসী, চারিদিকে দেখতে পাই বিস্তীর্ণ সবুজ ক্ষেত। বাতাস

এসে ঢেউ খেলে যায় এই শ্যামল ক্ষেতের উপর, চিত্তে দিয়ে যায় দোলা। কিন্তু এখানে এই পাহাড়-ঘেরা প্রকৃতির যে নব নব অভি-নবত্বের পরিচয় পেলুম ; সেটা বার বার আমার মনে এসে নতুন ভাবে দেখা দিতে লাগল। চারিদিকের বিরাট কাল পাথরের ঢেউ, সানুদেশে শ্যামল বনানী অথবা বৃক্ষলেশহীন প্রান্তর, পাহাড়ের শীর্ষ দেশের মন্দিরের চূড়া, নিত্য স্তোত্র পাঠ আর সঙ্গীতের ঝঙ্কার, এসব যেন নিত্য নতুন ভাবে এসে ধরা দেয়। একই রূপের বিভিন্ন বিকাশ।

বাস এসে থামল নাথদ্বারে, নানান পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। নাথদ্বারের মন্দিরটিও একটা পাহাড়ের উপর।

নাথদ্বারের একটা ইতিহাস আছে। আওরঙ্গজেব তখন মোগল বাদশাহ। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন আর হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বিনাশে তৎপর হয়ে উঠেছেন। হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে দেব দেবীর মুর্তি চূর্ণ করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করাই তার চরম লক্ষ্য। চারি দিকে ধ্বংস সাধন করে অবশেষে মথুরার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। মথুরার ব্রজ মণ্ডল প্রমাদ গণলেন। আওরঙ্গজেবের এই নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উপায় নির্ধারণ করতে লাগলেন তাঁরা। একমাত্র ভরসা ছিল মেবারের রাণা রাজসিংহ। তিনিই আরঙ্গজেবের এই হিন্দুবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। অগত্যা ব্রজমণ্ডল তাঁকেই গিয়ে ধরলেন, নাথজীর এই মূর্তি রক্ষার জন্য। রাণা রাজসিংহ সানন্দে সম্মতি দিলেন। নাথজীকে ব্রজ মণ্ডল নিয়ে এলেন নাথদ্বারে। তখন এস্থান ছিল পর্বতসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যে পরিপূর্ণ। যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে রাণা রাজসিংহের সংগ্রাম বাধল। আওরঙ্গজেব সে যুদ্ধে সুবিধা লাভ করতে পারলেন না।

পরবর্তী কালে এই গভীর বন পরিষ্কার করা হয় এবং মাথুরার অধিষ্ঠিত বিখ্যাত দেবতা নাথজীর জন্য নতুন একটি গৃহ নির্মাণ হয়। এই নতুন মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত হন মথুরাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ইনি নাথজী নামেই এখানে পরিচিত, এবং তাঁরই নামানুসারে এস্থানের নাম হয়েছে নাথদ্বার।

মন্দিরে ঢোকবার পথ তিনটি। সামনের পথকে বলা হয় সূরজ পোল। এপথ দিয়ে মহিলারা প্রবেশ করেন। চৌপাটির ভিতর দিয়ে আর একটা রাস্তা, পুরুষদের জন্য।

মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভক্তের সমাগম হয়। দেখলুম, সামনে মেয়েদের ও তার পিছনে লাঠি বেষ্টনী দিয়ে পুরুষদের জায়গা করা হয়েছে। ঠাকুর দর্শনের জন্য ভিড় ও ঠেলাঠেলি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা লোক মাঝে মাঝে কাপড়ের পাগড়ী দিয়ে দর্শকদের প্রহার শুরু করেছে। দেবমন্দিরে এই অদ্ভুত অপমানকর ব্যবস্থা দেখে দুঃখিত হলুম। শৃঙ্খলারও যেমন বালাই নেই, ঔষধের ব্যবস্থাও তেমনি তিক্ত কর। কেমন যেন একটা বিরক্তির সঞ্চার হয়।

অনেকটা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। অন্ধকারময় ঘর। স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। ভাবলুম, অনেকদিন ধরে যাকে দেখবার জন্য মন ব্যাকুলিত হচ্ছে, তাকে কি না দেখেই ফিরে যাব। মথুরাধীশ নাথজীর কি কোন কৃপাই বর্ষিত হবে না?

সহসা মন্দিরে প্রদীপ জ্বলে উঠল। পূজারী এলেন জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে আরতির জন্য। নাথজীর প্রশান্ত বদন স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ধরা পড়ল। শ্রদ্ধায় ভরে গেল বুক। এদের ঐশ্বর্যের ভিতরে থেকেও তুমি অন্তরের ব্যথার পরিচয় পেয়েছ ব্যথাহারা ভগবান, তাই তোমায় দেখতে পেলুল। তুমি বিকাশলাভ কর সবার

অন্তরে, সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন আর ধর্ম সংস্থাপনার জন্য তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছো। আজ তোমার বড় প্রয়োজন ঠাকুর। মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন কর; তাকে কল্যাণের পথে নিয়ে চল। জগৎহিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

উদয়পুর থেকে নাথদ্বার ২৮ মাইল। স্টেশন থেকে বাসেও আসা চলে।

আরতির পরে পুরুষ ও মেয়েরা নৃত্যগীত করতে লাগলেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হল।

শহর ভ্রমণে বের হলুম। খুব ছোট শহর। তীর্থকে কেন্দ্র করেই শহরটি গড়ে উঠেছে। চারিদিকে অনুচ্চ পাহাড়। পাহাড়গুলো যেন সব একলিঙ্গদেবের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে।

রাস্তায় নাথজীর প্রসাদ বিক্রয় করতে দেখলুম। একটা লাড্ডু কিনে নিয়ে খেলুম। আহারের সন্ধানে লছমী হোটেলে উঠলুম। এই হোটেলই নাকি নাথদ্বারের মধ্যে ভালি।

খাবার যা সামনে এল, তা মুখে রুচল না। নোংরা পরিবেশ, অসংখ্য মাছি ভন ভন করে উড়ছে। দেখলেই নাড়ীভূড়ি পর্যন্ত অচল হয়ে যায়। কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করলুম, গা-টা ঘিন ঘিন করলে লাগল। আমাদের ভাগ্যে তবুও দু-এক-টুকরো রুটি জুটল, কিন্তু পরে যাঁরা এলেন, খাবার নেই বলে হোটেলওয়ালা তাদের বিদায় দিলেন। এমনি অবস্থা।

বাসে উঠে আবার রওনা হলুম। বাস ক্রমশঃ নীচে নেমে এসে সমতলভূমিতে পড়ল। অনেকটা পথ চলে এসে পড়লুম রাজ-সমুন্দে। এখান থেকে উদয়পুরের দূরত্ব ৪০ মাইল।

রাজসমুন্দ কথাটার বাংলা অর্থ রাজ সমুদ্র। প্রকাণ্ড একটা

দীঘি আছে, এই দীঘিটি দুর্ভিক্ষে প্রজাদের সাহায্য করবার জন্য খনন করেছিলেন রাণা রাজসিংহ। সে থেকেই এর নাম হয়েছে রাজসমুন্দ।

চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা; তার মাঝেই এই প্রকাণ্ড দীঘি। এর একদিকের পাহাড়ের উপর সরকারী গেস্ট হাউস, রাণা রাজসিংহ এটা নির্মাণ করেছিলেন! এর পাশে দীর্ঘস্থান জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট। সেটা প্রায় এক ফার্লং লম্বা। এই ঘাটের উপর রয়েছে মার্বেল পাথরের ঘর। এখান থেকে রাজ সমুন্দের দৃশ্য দেখা যায়। ঘাট থেকে নেমে গেছে পর পর অনেকগুলো সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে অনেক নীচে নেমে গেলে জলের সন্ধান মেলে। তিনশ বছর আগেকার ঘাট, আজও সুন্দর আছে।

আমরা গেস্ট হাউসেই আশ্রয় পেলুম। পাহাড়ের শীর্ষদেশের কাছাকাছি গেস্ট হাউস। আধুনিক সমস্ত ব্যবস্থাই আছে এতে। হ্রদটার দৃশ্যও অতি সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

গেস্ট হাউসের একটা জানালার ধারে বসে দীঘিটার দৃশ্য দেখতে লাগলুম। দৈর্ঘে প্রস্থে এটা অনেক বড় দীঘি। এইজন্যই এর নাম হয়েছে সমুদ্র। এ পর্যন্ত সাগর নামধারী যে হ্রদগুলি দেখে এসেছি, সেগুলি এর তুলনায় অনেক ছোট। গভীর এর জল, তবু একপাশে শুকিয়ে গেছে এবং সে স্থানে রচিত হয়েছে শস্যশ্যামল ক্ষেত। চারি ধারে পাহাড় বেষ্টন করে রয়েছে, শুধু একপাশে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে পাথরের প্রাচীর।

দূরে পশ্চিম আকাশে সূর্য এলিয়ে পড়েছেন। গমনোন্মুখ সূর্যের রক্তিমাভা এসে পড়েছে বিরাট এই দীঘির মৃদু সঞ্চরণশীল জলে। চারিদিকে শান্ত, নিস্তব্ধ, সুন্দর একটা পরিবেশ।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বন্ধুবান্ধবেরা তখন চায়ের

পেয়ালায় আলোচনার তুফান লাগিয়ে দিয়েছেন। দলে মিশে হৈ চৈ করব কিম্বা নিতান্ত একমনে বসে প্রকৃতির দৃশ্যে বিভোর থাকব, ভাবতে লাগলুম। এমনি সময় বাপাইয়া এসে বলল, আজ এমন একটা দৃশ্য দেখাবযা কোনদিনই ভুলতে পারা যাবে না।

কৌতূহলী হয়ে তার পিছু নিলুম। অন্ধকারের মধ্যে সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙ্গে ছাদের উপরে এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে মার্বেল পাথরের খুব ছোট একটা ঘর। সেখানে গিয়ে বসলুম। বাপাইয়া বললে, রাজ সমুন্দের এমন রূপ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না।

মরি! মরি! কি সৌন্দর্য! দূরে পাহাড়ের একপাশে দেখা যাচ্ছে শহরের আলোর—তারার ন্যায় ঝিকিমিকি খেলা, মাঝখানে এই সুবিস্তৃত জলাশয়ে চলেছে বসন্তের মৃদু হিল্লোলে ঢেউগুলির দোদুল নৃত্য। আকাশে উঠেছে চাঁদ, জ্যোৎস্নায় স্নাত হয়েছে সমস্ত অঞ্চল। ঢেউগুলি সেই জ্যোৎস্নার আলোর প্রতিফলনে রূপার টুকরোর মত ঝলমল করছে। দূরের আকাশে পাহাড়ের মসীরেখা চিত্রের মত শোভা পাচ্ছে।

বাপাইয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, আজ যা দেখলুম, তা অপূর্ব। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে নাড়া দেয়, তার মনে আনন্দ জানায়, অনুভূতির স্পন্দনও আসে। কিন্তু সৌন্দর্যের এই যে বিপুল বিকাশ শান্ত সমাহিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, অন্তরটাকে করে তুলেছে উদ্ভাসিত, আনন্দ মুখর, তার অবদানকে অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই।

বাপাইয়া স্বীকার করে জানান, এই জন্যেই কীট্‌স্‌ বলেছেন: "A thing of beauty is a joy for ever." নীচের হৈ চৈ থেকে এ পরিবেশটা কত ভাল, মনে পড়ছে আমার সুন্দর একটা

কবিতার ছত্র : "There is a company where none intrudes there is a music on the lonely shore, I love not the man less, but nature more."

সায় দিয়ে জানালুম, কথাটি কত বড় সত্য !

কিছুক্ষণ পরে বাপাইয়া দূরে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করে বললে, ঐ পাহাড়ের গায়ে মহাকালীর মন্দির আছে। রাণা রাজসিংহ যখন মোগল যুদ্ধে বিপদ্‌গ্রস্ত, তখন রাণী এসে উপবাসী থেকে মহাকালীর কাছে বিপন্মুক্তির প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। স্বপ্নাদেশে তিনি দেবীর আশীস পান এবং তার পরেই যুদ্ধজয়ের মঙ্গল সংবাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছয়।

জানালুম তাকে, কাল যাব মাতৃদর্শনে।

পরদিন মায়ের মন্দিরে গেলুম। ছোট মন্দির গৃহ। সামনে গণেশের মূর্তি। মন্দিরের দ্বার তখন রুদ্ধ। দূর থেকেই মাকে প্রণাম জানালুম। মন্দিরটি বাঁধানো ঘাটের পাশেই।

ঘাটে এসে দেখতে পেলুম, অরুণোদয় হচ্ছে। প্রভাতী সূর্যের মঙ্গল-আলোক সেই সুন্দর পরিবেশে দেবীর আশীর্বাদের মতই আমার মস্তকে ঝরে পড়ল। হে সৌন্দর্য বিহারী দূত, জবাকুসুম-সঙ্কাশ, তোমাকে নতি জানাই !

রাজসমুন্দের গ্রামাঞ্চল ভ্রমণে বের হলুম। পাহাড়ের নীচেই রাজনগর—একটা সমৃদ্ধ পল্লী। বাড়ীঘরগুলো সব পাকা। কয়েকটা ছোট ছোট দোকানও আছে। রাজসমুন্দকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এ পল্লী। ঘরে ঘরে দেয়াল চিত্রও প্রচুর দেখলুম।

এ অঞ্চলের অধিকাংশই কৃষিজীবি। গম, যব, চানা, মক্কা, সল্লা, কাপাস, তিলহল, এসবের চাষই বেশী।

রাজনগর থেকে গেলুম সওয়ালী গ্রামে। পাহাড়ের নিম্নদেশে এ গ্রাম, অল্প কয়েক ঘর বসতি। মেয়েরা এক মহিলা মণ্ডল গঠন করেছেন এখানে। অম্বর চরকার কাজ চলছে। মেয়েরা সবাই পর্দানসীন।

রাজস্থানের গ্রামের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রামের মধ্যে গাছ ও তার নীচে সিন্দুর মাখানো দেবদেবীর মূর্ত্তি অথবা পাথর।—এখানে সমারোহের সঙ্গে পূজো হয়। গ্রামের লোকেরা এসে এর তলায় বসে নিত্য আলোচনা করেন। এগ্রামেও তার ব্যতিক্রম দেখতে পেলুম না। গাছের তলায় সিন্দুর মাখানো হনুমানজী। গ্রামের মধ্যে পবিত্র স্থান এটা। গ্রামের সংস্কৃতির কেন্দ্র ও আলোচনা বৈঠকও বটে।

কেলোয়া গ্রামে গেলুম। পাহাড় কেটে অনেক জমি বের করে এখানে চাষবাসের কাজ চলছে। সেখান থেকে কেনাকোল গ্রামে গিয়ে এক চাষী পরিবারের কার্য দেখে মুগ্ধ হলুম। এঁরা পিতা-পুত্র মিলে কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়ের সান্নুদেশে কয়েক বিঘা জমি তৈরী করতে পেরেছেন। এঁরা গৃহস্থ মনুষ, চাষবাসেই অভ্যস্ত। বাড়ীর বর্ষীয়সী মহিলারা সানন্দে আমদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন। সহজ সরলভাব তাঁদের সে আলাপনে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

বাস্নুন্দ গ্রামে একটা আদর্শ কূপ দেখলুম। নল বসিয়ে জল তুলবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সেটা আর এখন কার্যকরী না থাকায় হ কল বসিয়ে জল তুলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশে রয়েছে পশুদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা। বহু উট জড়ো হয়েছে সেখানে পানীয় জলের আশায়। এর মধ্যে কয়েকটা কাল রঙয়ের উট দেখলুম। এর আগে কাল রঙয়ের উট দেখতে পাইনি। একটা লাঠি দিয়ে উট

তাড়া করছে অতি ক্ষুদ্র এক শিশু। সাত আট বছর বয়স হবে তার। কোন ভয় নেই। উটগুলোও তাকে নির্বিবাদে মেনে নিচ্ছে।

গ্রাম থেকে ফেরবার পথে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। বাস অনেকটা এগিয়ে এসেছে, এমন সময় হৈ হৈ করে অনেক লোক এসে জোর করে বাসটা থামিয়ে দিল। তাদের হাতে লাঠি এবং আরও যন্ত্রাদি। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বড় পাথরের টুকরো এসে বাসের আশেপাশে পড়ল। ছোট ত্থু-একটা টুকরো বাসের গায়ে এসে লেগে ঝন ঝন করে উঠল। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম। ব্যাপার কি? কোন বিপদ আপদ নয় তো?

বিপদের জন্য এ অভিযান নয়। বিপদ নিবারণের জন্যই এই অভিযান। একটু পরেই তা জানা গেল। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে অল্পের জন্য। পাহাড়ে বারুদ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। পাথর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। লোকগুলো জোর করে বাস থামিয়ে দিয়েছে তাই রক্ষা। নইলে বাস বিস্ফোরণের মধ্যে গিয়ে পড়ত। একটু পরেই বাস আবার রওনা হল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে তখন।

পরদিন প্রত্যূষে রওনা হলুম দিল্লীর পথে। পথে পড়ল কাক-রোলী। রাজসমুন্দের পাহাড়ের গায়েই এই সহর। সহর ছোট হলেও মন্দ নয়। বৈত্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। কাল গেস্ট হাউস থেকে এরই আলো দেখতে পেয়েছিলুম। এখানে দ্বারকাধীশের মন্দির আছে। রাজস্থানের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বাস থামল পাহাড়ের তলায়। এখান থেকে হেঁটে যেতে হবে খানিকটা। সরু রাস্তা, বাস চলাচলের উপযুক্ত নয়।

দ্বারকাধীশ মন্দিরে উপস্থিত হলুম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে

দ্বারকার অধিপতি রূপে বিরাজ করছেন। কিছু ফুল কিনে মন্দিরের একপ্রান্তে তেতলায় গিয়ে উঠলুম। ফুলঘরে ফুল জমা দিয়ে এলুম। এর পাশেই রয়েছে জলঘর পানঘর ইত্যাদি।

মন্দির তখনও খোলা হয় নি। বৈতালিক বীণা বাজিয়ে গান করে দেবতার নিদ্রাভঙ্গ করলেন। গানের সুরটি বেশ ভাল লাগল।

গেটের উপরে নহবতখানা, দেওয়ালে দুটি হাওদা সহ হাতীর চিত্র।

মন্দিরের একপাশে বাঁধানো ঘাট, সেখানে শত শত মাছ আনন্দে খেলা করছে। স্নানরত বহু লোক তাদের পাশেই রয়েছে, কিন্তু তাতে কোন ভয় নেই তাদের। কিছু খাবার কিনে দিলেই বিপুল মাছের সমারোহ দেখা যায়।

কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের দুয়ার খুলল। ঠাকুরের রাজবেশ এখানে। ঐশ্বর্যের প্রতীক হয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের পূজার আয়োজনও রাজসিক ; রাজার অনুকরণে গড়া।

পাশে মথুরাজীর মন্দির। দেবদর্শন করে বাসে ফিরে এলুম।

বাস চলতে লাগল। মাঝে কোয়ারিয়া স্টেশনের গেটের কাছে এসে থামল। একটা গাড়ী আসছে, অপেক্ষা করতে হবে। ছোট স্টেশন এটা। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড় ; তার চারি পাশে সুদীর্ঘ প্রান্তর। ঘোড়া, গাধা, উট, ছাগল সে প্রান্তরে চরে বেড়াচ্ছে। দূরে একটা মন্দিরেরর চূড়া পাহাড়ের গায়ে ভেসে থাকতে দেখা গেল।

মালগাড়ী এসে পড়ল একটা। প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণ করে চলে গেল সেটা। বাস আবার চলতে লাগল।

কুঁজো গরুর গাড়ীগুলো তূলো বোঝাই করে চলেছে আপন মনে। বাস তাদের অতিক্রম করে কুড়না গ্রামে এসে পৌছল। রাস্তা এখানে খুবই খারাপ। তাছাড়া অপরিসর, সেজন্য বাস চালান কষ্টসাধ্য।

দুধারের ঘরবাড়ীগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে রাস্তার মধ্যে এসে পড়েছে। বড় বাসটা কি করে এই গ্রাম অতিক্রম করে যাবে, সেটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অনেক কষ্টে, অতি সন্তর্পণে, বার বার বাস থামিয়ে ড্রাইভার বাস চালাতে লাগল। কোনমতে এইটুকু রাস্তা অতিক্রম করতে হবে, নইলে আবার সেই ফেরা পথে সুদূর রাস্তা অতিক্রম করে আসতে হবে। অনেক কষ্টে গ্রামটা পার হওয়া গেল, তার পরে দেখা গেল ভাঙ্গাচোরা অপরিসর রাস্তা। অনেক কষ্টে সেটুকুও অতিক্রম করা গেল। এর পরেই এসে পড়ল প্রশস্ত বড় রাস্তা।

বাস পূর্ণ গতিতে ভীলবাড়ায় এসে পৌঁছল। অন্য পথে ফিরে এসেছি আমরা ; তাই চিতোর গড় দূরেই পড়ে রইল।

ভীলবাড়ার একটা হোটেলে আহার সমাপন করে আবার আমরা বাসে চাপলুম। বেলা দুটোর সময় এসে পৌঁছলুম আজমীড়ে। একটু পরেই আবার বাস ছাড়ল। অপরাহ্নে এসে পৌঁছলুম আলমোড়ায়।

আলমোড়ার সামাজিক শিক্ষাধিকারিকা মিসেস মুখার্জী আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। সানন্দে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলুন। বৈকালিক চা পানে অপ্যায়িত করলেন তিনি। একটু বিশ্রামের পর ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলুম আমরা।

বাস পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে। বপাইয়া আমার পাশে বসেছিল। আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে যে, সূর্য যাচ্ছে ডুবে। দিন হয়ে এল শেষ।

অস্তগামী সূর্যের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। অস্তাচল-গামী সূর্য আকাশে লাল হয়ে উঠেছে। দিগন্তের পরিচিতি ফুটে উঠেছে পশ্চিম আকাশের কোণে। আমাদের যাত্রারও অবসান হয়ে উঠেছে।

মানুষের যাত্রাপথ কতটুকু। সে কি শুধু এই জীবন স্পন্দনের ক্ষণিক অংশ নিয়েই ব্যস্ত, না মহাকালের কালের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। মানুষের দেহ পরিবর্তন তো শুধু জীর্ণ বাস পরিত্যাগের পরিচিতি। মানুষের আত্মা চলেছে, জীবনের ক্ষণিক স্পন্দনে সে ধরা পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চলার তো বিরাম নেই। সমস্ত বিশ্বজগতটাই তো চলার গতিতে চঞ্চল।

তবু মানুষের জীবন, ক্ষণিক স্পন্দনের রূপ নিয়েই তার বিকাশ। এই স্পন্দনটুকুর সচেতনার ইঙ্গিতে তার চিত্ত হয় অধীর। প্রকৃতি এনে দেয় সে ইঙ্গিত, চলমান মন সে ইঙ্গিতের পরিচিতি জানায়। পথ প্রকৃতিকে নানা ভাবে বহন করে আনে, মানুষের মনে জানায় তার প্রভাব।

ভাবতে লাগলুম, ঐ অস্তগামী সূর্যের বিপুল ইঙ্গিতে আমার মনের ভাবটা মূর্ত হয়ে উঠল কি না?

হরিদ্বার

মার্চ মাসের শেষ ভাগে রওনা হলুম হরিদ্বারে। পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে এবার আজ একজন নতুন বন্ধু সঙ্গী হলেন। ইনি মধ্য প্রদেশের নীলম চাঁদ কোচার। অসুস্থ শরীর নিয়েই আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন। দিল্লী স্টেশনে এসে দেখি লম্বা কিউ পড়ে গেছে টিকিট কেনার প্রত্যাশায়। এরই দীর্ঘ লেজের শেষপ্রান্তে মিশ্র গিয়ে

দাঁড়াল। আমরাও জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে হাজির হলুম।

ট্রেন এসে হাজির হল স্টেশনে। মিশ্রের দেখা নেই। কিছুক্ষণ পরে মিশ্র হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। আমরা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ভিড়ও অনন্ত। অনেক ঠেলাঠেলি ও কসরতের পর সবাই গাড়ীর অভ্যন্তরে স্থান পেলুম বটে, তবে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। অথচ সারারাত এই ট্রেনেই যেতে হবে।

এক ভদ্রলোক গোটা একটা বেঞ্চি দখল করে শুয়ে ছিলেন। মিশ্র সবিনয়ে তাঁকে উঠবার প্রস্তাবনা জানাতেই, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন! মিশ্র বিনয়ের সঙ্গে কঠোরতা প্রদর্শন করে জানাল, উঠতে হবে, এত-গুলো লোকের অসুবিধা করা চলে না।

ভদ্রলোক দম্ভের সঙ্গে জানালেন, নেহি, ইয়ে বেঞ্চ রিজার্ভ হ্যায়।

অতঃপর মিশ্রের সঙ্গে তার হিন্দী ও ইংরাজীতে বাদানুবাদ চলল। মিশ্রের সঙ্গে আমিও তাকে সীট ছেড়ে দেবার জন্য বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলুম। কিন্তু ভদ্রলোকের জিদ অচল, অনড়। দীর্ঘ বেঞ্চটা আঁকড়ে রেখে তিনি যুদ্ধংদেহি মনোভাব অবলম্বন করলেন। তার দু-চার জন বন্ধুও পাশের বেঞ্চি থেকে তাকে অহেতুক উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমি ভাবতে লাগলুম, তীর্থ যাত্রার পথে যুদ্ধ করাটা সমীচীন হবে কি না? অথচ এরূপ অন্যায় ব্যাপারও সমর্থন করা চলে না। প্রতিকার প্রয়োজন।

মিশ্র বললে, এ হতেই পারে না। হয় ও রিজার্ভ করার প্রমাণ দেখাক, নয় ওকে সীট ছেড়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে। সুতরাং এর একটা প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে।

সীট থাকতে সারা রাত দাঁড়িয়ে যাব, আর এই ভদ্রলোক অন্যায় করেও চোখ রাঙিয়ে যাবেন এটা সহ্য করা যাবে না।

মিশ্র ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, ধোয়া কাপড় জামা পরলেই ভদ্রলোক হওয়া যায় না। ব্যবহারে সেটা প্রমাণ হয়।

ভদ্রলোক ফোঁস করে উঠলেন একথায়। রেগেমেগে কি বললেন, তা বোঝা গেল না।

মিশ্র রেগে বললে, দেখি আপনাকে সীট ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারি কি না!

গাড়ী তখন ছাড়ে ছাড়ে। মিশ্র নিষেধ মানল না। রেলের পুলিশ ও কর্মচারীর সন্ধানে নিচে নেমে গেল।

আমরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম। দুর্ব্যবহারের প্রতিকার চাই। বাদানুবাদ চলতে লাগল কঠোর ভাবেই। পরিস্থিতিটাও যুদ্ধের অনুকুল হয়ে দাঁড়াল। অগত্যা ভদ্রলোক রাগে গজ গজ করতে করতে বেঞ্চিটার প্রায় অর্ধেক ছেড়ে দিলেন। আমরা তিনজন সেখানে বসে পড়লুম। ইতিমধ্যে মিশ্র রেলওয়ে পুলিশ ও গার্ডসহ এসে হাজির হল।

দেখা গেল ভদ্রলোকের রিজার্ভের কোন বালাই নেই। টিকিটই মোটে করা হয়নি। বোধহয় রেলওয়ের কোন কর্মচারী। ফিসফিস করে কি যেন আলাপ হল; ভদ্রলোক শেষটায় প্রায় দু' জনের জায়গা দখল করে পা নামিয়ে বসল। মিশ্রেরও বসার জায়গা মিলল। গাড়ীটাও ছেড়ে দিল এই সময়ে।

বস্তুতঃ ট্রেন ভ্রমণে দেখা যায়, অনেকেই অন্যের অসুবিধার কথা মোটেই চিন্তা করেন না। অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করা তো সাধারণ ব্যাপার; অন্যের স্থান দখল করে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য

ভোগের ব্যবস্থাও নতুন নয়, কিন্তু বিনা টিকিটে চোখ রাঙ্গানোও বড় কম যায় না। ট্রেনে ওঠা আজকাল প্রাণান্তকর। কেউ শৃঙ্খলা মেনে চলেন না। দরজার কাছেই ভিড়টা জমে বেশী। ঠেলা-ঠেলির ফলে ঢোকবার অসুবিধার অন্ত নেই। অথচ সবারই উঠতে হবে। কিউ করে ট্রেনে উঠা অভ্যাস এখনো হয়নি, তাই অসুবিধারও অন্ত নেই।

হরিদ্বারে এসে পৌঁছলুম ভোরে। জিনিসপত্র বগলদাবা করে টাঙ্গার সন্ধানে বের হলুম। ভাড়ায় পোষাল না দেখে সবাই রিক্সা চেপে রওনা হলুম হরকিপাইরির উদ্দেশ্যে। সর্বাগ্রে ব্রহ্মাকুণ্ডে স্নানটা সেরে নিতে হবে।

হরিদ্বার। ভগবানের রাজত্বে পৌঁছাবার দ্বার এটা। সারা ভারতের কোটি কোটি নরনারীর শ্রদ্ধার স্থান। এখান থেকেই হিমালয়ের অভ্যন্তরে বদরিনাথ, কেদারনাথ, কৈলাস, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাবার পথ আছে। পাহাড়তলীতে এই স্থান। এর পরেই রয়েছে ঘন বনানী আর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ বহুল হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী!

এই হিমালয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন ধ্যান সমাধিমগ্ন ঋষিগণ। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ এবং হিমালয়ের স্নিগ্ধতাও গাম্ভীর্য সাধনার পক্ষে বড় অনুকূল। জন কোলাহল হতে দূরে, সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট ও প্রতিকূল অবস্থার বাইরে গঙ্গার পবিত্র বারি বিধৌত এই পার্বত্য মনোরম স্থানগুলি মনকে উন্নতস্তরে নিয়ে যায়।

হরিদ্বার প্রাচীন তীর্থভূমি। স্কন্ধ, পদ্ম ও শিব পুরাণে এই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পাদকমল স্পর্শে ধন্য হবার কথা উল্লেখ আছে। রাজা শ্বেতুর তপস্যায় প্রীত হয়ে ভগবান ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ডে

বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন থেকে এস্থান ব্রহ্মপুরী নামে খ্যাত। ভগবান বিষ্ণু হরিকিপাইরিতে কল নাদিনী গঙ্গার রাখা পদকমল স্পর্শ করেন। হরিদ্বার নামকরণ এই থেকেই হয়।

ব্রহ্মাতনয় দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে স্বীয় দুহিতা সতীর প্রতি ভৎর্সনা ও জামাতা মহাদেবের নিন্দা করায় সতী দেহত্যাগ করেন। কৈলাসাধীপ মহাদেব এতে ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষযজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড করেন, দক্ষরাজ্যেরও বিনাশ হয়। সতীদেহ স্কন্ধে বহন করে মহাদেব প্রলয় নাচনে মত্ত হলে সৃষ্টির বিনাশ আশঙ্কায় ভগবান বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীদেহ খণ্ডিত করেন ও মহাদেবকে শান্ত করেন। ভারতের একান্নটি স্থানে এই সতীদেহ পতিত হয়; এবং প্রত্যেক স্থানই মহাপাঠ স্থান নামে খ্যাত হয়। সতী যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন, সে স্থান কনখল, বর্তমান হরিদ্বার শহরের একাংশ।

হরিদ্বারের উপরেই মনসা পর্বত। এই মনসা পর্বতেই শুম্ভ-নিশুম্ভের সঙ্গে মহামায়া চণ্ডিকা দেবীর যুদ্ধ হয় এবং দৈত্যকুল তাতে বিনষ্ট হয়। গঙ্গার নীলধারার পাশে চামুণ্ডা পর্বত। এই পর্বতের উপর চামুণ্ডা দেবীর মন্দির। মহামায়া বিভূতির সাহার্যে চামুণ্ডা রূপ পরিগ্রহ করে চণ্ডমুণ্ড দৈত্য বধ করেন এবং চামুণ্ডা এই নামে খ্যাত। ভারতের প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীতে এর বর্ণনা আছে।

দ্বাপর যুগে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ ভরত এই হরিদ্বার তীর্থে আগমন করেন। মহাভারতীয় যুগে পাণ্ডবগণ এই পথেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন। ভীমগোদা তারই স্মারক চিহ্ন। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তি এঁরাও আত্মার মুক্তি সাধরের জন্য এই তীর্থস্থানে আসেন। এই হল এর প্রাচীন ও পৌরাণিক ইতিহাস।

কবি কালিদাস নাগাধিরাজ হিমালয়কে দেবাত্মা হিমালয়রূপে

বর্ণনা করেছেন। উত্তর দিকে নাগাধিরাজ হিমালয় পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রে স্নাত হয়ে পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছেন, এই হল তাঁর বর্ণনা। মেঘদূতেও হিমালয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এই হিমালয়ের পথেই ভারতে আসেন। মোগল সম্রাট-গণের রাজত্বকালে বহুবার এই তীর্থস্থান লুণ্ঠন ও মন্দির ধ্বংস করা হয়। এখনও সে চিহ্ন বর্তমান।

হরিদ্বার সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট উঁচু। এর তিন দিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। দূরে বড় বড় শৃঙ্গগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের তরঙ্গের মত সে শৃঙ্গগুলি চারিদিকে ছড়ানো। পাহাড়ের সানুদেশে জঙ্গল। কোথাও বড় গাছ, কোথাও বা ছোট। পক্ষিকুলের কলকাকলি মুখরিত।

হরিদ্বারের মূলধন বনজসম্পদ। পাইন দেবদারু প্রভৃতি গাছ প্রচুর, বাঁশও পাওরা যায়। অনেক কাঠ নদীস্রোতে ভাসিয়ে এনে এখানে সংগ্রহ করা হয়। লোকসংখ্যা ষাট হাজার ছিল, এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জনবহুল স্থানের জীবিকা সংস্থানের প্রধান উপায় তীর্থযাত্রীর সমাগম। প্রতি বছর বহু ভ্রমণার্থী ও তীর্থযাত্রীর আনাগোনা হয় এখানে। এথেকে প্রচুর অর্থাগম হয়।

হরিদ্বারের পরম গৌরব কলুষনাশিনী গঙ্গা। পাহাড়ের বাঁধন থেকে এখান হতেই তাঁর মুক্তিপথ রচনা হয়েছে। স্বচ্ছতোয়া ধারা, গ্রীষ্ম সমাগমে ক্ষীণতোয়া হলেও স্রোত বেশ প্রবল বেগেই বেয়ে চলে। ব্রহ্মকুণ্ডের কিছু আগে বড় একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। পাশে খনন করা হয়েছে একটা ক্যানেল। ব্রহ্মকুণ্ড ঘিরে এই ক্যানেলের জল প্রবল বেগে বয়ে চলেছে উত্তর ভারতের নানা স্থানে। এর জল সিঞ্চনে অনুর্বর জমি হয়েছে উর্বরা। দীর্ঘ বিস্তৃত এই ক্যানেল।

ব্রহ্মকুণ্ডে এসে পৌঁছলুম সূর্যোদয়ের কিছু আগে। পথে পড়ল মৃত্যুঞ্জয় দেবী প্রতিমা। সদর রাস্তার উপরে এই মূর্তি। ষষ্ঠভূজা, ছুটি হাত মাথার উপর; হাতের সঙ্গে কলসী লাগানো। কলসীর ভিতর দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে প্রতিমার মাথার উপর।

ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট বাঁধানো। ঘাটের মুখে জুতো জমা দিয়ে আসতে হয়। ।ব্রহ্মকুণ্ডের বহির্ভাগে গঙ্গার ধারে প্রথমটা উপস্থিত হলুম। এখানে স্নানার্থীদের সুবিধার জন্য অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর বেঁধে পাণ্ডারা থাকেন। গঙ্গা পূজা বা স্নানের ব্যবস্থা এরাই করে থাকেন। দক্ষিণা নিয়ে বেশী কড়াকড়ি নেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অভাব নেই। তীর্থস্থান ঘিরে পাণ্ডাদের যা জুলুমের পরিচয় নানা স্থানে পাওয়া যায়, এখানে সেটা নেই। বেশ একটা শান্ত পরিবেশে এরা কাজ করেন।

নদীর মাঝখানে একটা শান বাঁধানো ভূখণ্ড। পারাপারের জন্য সুদৃঢ় ব্রীজ আছে। পার হয়ে গিয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারে স্নান করা যায়। এতে যাত্রীদের ভিড়ের সময় স্নানের সুবিধা হয়। ব্রহ্মকুণ্ডের জল অগভীর। যাত্রীরা যাতে স্রোতে ভেসে না যায়, সেজন্য রয়েছে সতর্ক ব্যবস্থা। কাজেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এখানে স্বচ্ছন্দে নির্ভয়ে স্নান করতে পারে।

অগুণতি মাছ নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে খাবারের লোভে মানুষের গা ঘেঁষে চলে। মাছের খাবার গঙ্গার ধারেই স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। দু-চার পয়সার খাবার নিয়ে জলের মধ্যে ছিটিয়ে দিলেই মাছদের তুমুল সমারোহ লেগে যায়। বেশ উপভোগ করা যায় সে দৃশ্য। সবাই কিছু না কিছু খাবার কিনে পরিবেশন করে মৎসলীলা উপভোগ করেন।

দ্বীপটির শান বাঁধানো চত্বরের একপাশে পণ্ডিত মালব্যের প্রতিমূর্তি। স্থির গম্ভীর আনন সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছে।

বাসন্তী পূর্ণিমা, তাতে আবার চন্দ্রগ্রহণের যোগ থাকায় যাত্রীর সমাগম হয়েছে বেশি। ভারতের নানা স্থান থেকে লোক এসেছে। ভাষা এদের বিভিন্ন, রুচিও বিভিন্ন কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতি এক, তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সমন্বয় ঘটেছে। ধর্ম পিপাসু যাত্রীরা নানান সুরে স্তোত্র গান করছেন। এদের উচ্চারণ ভঙ্গী পৃথক হলেও মূল সংস্কৃতের উচ্চারণই ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচিতি জানিয়ে দিচ্ছে।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘিরে ছোট ছোট অনেক মন্দির গড়ে উঠেছে। জানা-অজানা অনেক দেব দেবীই এই গঙ্গাকূলে আশ্রয় নিয়েছেন। গঙ্গা, পার্বতী, গণেশ, রামসীতা, বিষ্ণু, মহাদেব প্রভৃতি দেব দেবীও এঁদের মধ্যে আছেন।

স্নানাদি সেরে একটা আশ্রয়স্থানের সন্ধানে বের হলুম। ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরেই একটা ধর্মশালায় আশ্রয় পাওয়া গেল। দোতলায় ছোট একটা ঘর। দৈনিক ভাড়া পাঁচসিকা। জিনিসপত্র সেখানে রেখে আমরা মনসাদেবী দর্শন মানসে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠবার ব্যবস্থা করলুম।

মনসাদেবী পর্বত। হরিদ্বারের গা ঘেঁষে এর অধিষ্ঠান। এই পাহাড় ভেদ করে চলে গেছে সুদীর্ঘ একটা টানেল। হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ রেলপথে যেতে এই টানেলের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। টানেলের উপরে পাহাড়ে বসে দেখতে পেলুম যাত্রীবাহী রেলগাড়ী প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে সরীসৃপের মত টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

মনসাদেবীর পাহাড়ে উঠবার কোন পথ নেই। পাহাড় বেয়ে শুধু মানুষের পায়ে চলার পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটাও আবার অনেক স্থানে কাঁটায় আর জালিতে বোঝাই। জুতা পায়ে দিয়ে উঠবার উপায় নেই; অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ। যে কোন মুহূর্তে পা

পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই নীচের একটা দোকানে জুতো জমা দিয়ে আমরা এঁকে বেঁকে অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। পাহাড়টা খুব উঁচু। কোন কোন জায়গায় পাথরগুলো এমনি ভাবে সাজানো যে সেটা বেয়ে উঠা দুষ্কর। পাথরগুলোও ঘষে ঘষে অনেক জায়গায় পিচ্ছল হয়ে রয়েছে, তার উপর আবার রয়েছে বালি ; সুতরাং পা দুটোকে নন্তর্পণে এগিয়ে দিতে হয়।

অনেক পরিশ্রমের পর পাহাড়ের শীর্ষদেশে মন্দিরে এসে পৌছে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলুম। চোখের সামনে যে দৃশ্য পড়ল, সেটা সত্যই অভিনব। সারা হরিদ্বার সহরটা দেখা দিল ক্ষুদ্র আকারে, গঙ্গার নীল ধারার বেষ্টনী সহরটাকে ঘিরে রয়েছে। দিগন্তে রয়েছে সুদূর বিস্তৃত হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ। এর যেন আদিও নেই, অন্তও নেই। ঢেউএর উপর ঢেউ বেয়ে চলেছে পাহাড়ের চূড়াগুলি যেন কোন অজানার দেশে। পাহাড়ের চূড়া ঘেঁষে চলেছে সাদা সাদা তুলোর আঁশের মত খণ্ড খণ্ড মেঘ। কেমন যেন বিরাট ইঙ্গিত দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় রূপের পরিচিতির দ্যোতনা জানাচ্ছে।

প্রাচীন ঋষিগণ উপাসনা করেছেন প্রকৃতির। সূর্য, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি ছিল তাঁদের উপাস্য দেবতা। এঁরা ধ্যানের দ্বারা পরম ব্রহ্মকেও উপলব্ধি করেছিলেন। সাকারবাদী ঋষিগণ উপাসনা করেছিলেন দেব দেবীগণের। এঁদের নিয়ে কত পৌরাণিক কাহিনও রচিত হয়েছে যুগে যুগে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রকৃতি একটা প্রবল শক্তি বিশেষ। এর অহরহ রূপান্তর ঘটছে।—এর বিনাশ নেই। জল দুটো গ্যাসের সমষ্টি, রূপান্তরে এরা আবার নিজ নিজ সত্ত্বায় ফিরে যায়।

কিন্তু এই শক্তির উৎসটা কোথায়? মূল শক্তির কেন্দ্রটা

কি? কোথা থেকে এ শক্তি উৎসারিত হল। বিজ্ঞানী এখানে নির্বাক।

মানুষ তাই খোঁজে, সারাজীবন ধরেই খুঁজে চলে। বিজ্ঞানীরা চায় প্রত্যক্ষ পরিচিতি। ভক্তিপ্রবণ মন চায় আশ্রয় ও অবলম্বন করে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই তাঁরা মনের মধ্যে শান্তির নীড় বাঁধেন। তাঁরা এই বিশ্বাসে ঠকেন কি জেতেন জানিনে। কিন্তু চার্বাক মুনির মত যুগ যুগ ধরে সমালোচকের অভাব না থাকলেও তাঁদের সংখ্যা বর্তমানেও বিরল নয়। তাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আদৌ ছিলেন, কিম্বা আছেন কিনা, রামসীতা-কৃষ্ণ-হনুমান এঁরা মানুষ অথবা ভগবান সে নিয়ে তর্ক করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের নেই। তাঁরা শুধু জানেন, দেবদেবী হচ্ছেন অন্তরের ধন, এঁদের পেতে হলে অন্তরটা ভরে দিতে হবে ভক্তির উৎসে; হৃদয়পদ্ম করে তুলতে হবে আধারের অনুকূল। ঋষিরা ধ্যানলব্ধ শক্তিমত্তার সেই আধার গঠনের পথেরই সন্ধান দিয়ে যান। ভক্তগণ ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠেন।

তাই গঙ্গা শুধু নীল ধারা নয়, প্রাণের উৎস। ভক্তি সিঞ্চনকারী রসধারা। "গঙ্গা মায়ী কি জয়" ধ্বনি হৃদয়ে জাগায় আনন্দের ব্যঞ্জনা, চোখে আনে আনন্দের অশ্রু।

দেবী দর্শন করলুম। মনসা দেবীর মন্দির গাত্রে দেখলুম দেবীর প্রণাম মন্ত্র লিপিকৃত:

"সুরম্যশৈলেপরিবনান্বিতে, বিরাজমানাং ভবতাপনাশিনীং।
স্বভক্তবাঞ্ছা পরিপূর্ণকারিণী, নমামিদেবীং মনসা পরাংশিবায়॥"

দেবীকে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলুম। উপরে উঠবার সময় যতটা বেগ পেতে হয়েছিল, নামবার পথে সেটা অনেকটা কমে গেল। তবু সতর্ক পদক্ষেপে নামতে হল।

নীচে শহরে চলেছে হোলি উৎসবের প্রবল কলোচ্ছ্বাস আর রংয়ের মাতামাতি। অনেকটা পথ নেমে এসে পাহাড়ের একপাশে মিশ্র থমকে দাঁড়াল। নীচে নামলে রং-বেরংয়ে চিত্রিত না হয়ে বাসায় ফেরবার উপায় নেই।

পাহাড়ের গায়েই ছোট একটা বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। গৃহস্বামীর বদান্যতায় একটা খাটিয়া পাওয়া গেল, তারই উপরে উপবেশন করে সহরের আনন্দোচ্ছ্বাস সমন্বিত ক্রীড়ানোদীদের আনাগোনা দেখতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ পরে সাহস সঞ্চয় করে নেমে এলুম সবাই। ছাদের উপর থেকে রং পড়তে লাগল। বাপাইয়ার ধোয়া জামাটায় পড়ল রংয়ের ছোপ, আমিও ছিটেফোঁটার হাত থেকে রেহাই পেলুম না। আর তিনজন সঙ্গী সেই প্রবল রং বরিষণের মধ্যেও নিজেদের জামা কাপড় বাঁচিয়ে বাসস্থানে পৌছতে সক্ষম হয়েছিল।

আহারের ব্যবস্থায় মুস্কিল হল। রংয়ের ভয়ে কেউ বাইরে যেতে চান না। হোটেলগুলোও বন্ধ। মিশ্র অন্য লোকের সাহায্য নিয়ে চা ও খানিকটা খাবার সংগ্রহ করল। তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল।

শেষরাতে মিশ্র গ্রহণের স্নানের জন্য রওনা হল। দিনের বেলায় বেশ গরম পড়লেও মার্চ মাসের শেষ রাতে শীতের পরিচয় পাওয়া যায়। মিশ্র ও রাওদ্বয় বাসায় ফিরে এলে আমিও স্নানটা সেরে নিলুম।

সহর দেখতে বের হলুম। ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে দেখতে পেলুম নেতাজীর মর্মর মূর্তি। গঙ্গার গা ঘেঁষে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছেন। এই সুদূরে স্বাধীনতার পূজারী নেতাজীর প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিচয় পেয়ে একটু আনন্দ পেলুম। নেতাজীর মর্মর মূর্তির পাদদেশে

প্রস্তর গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর জীবনী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদানের কাহিনী।

চারিদিকে চলেছে হোলীর গান। কোথাও রামায়ণ পাঠ ; কোথাও বা ভাগবত পাঠ চলেছে। কীর্তন ভজনের অবধি নেই। গঙ্গার ধারে ছোটখাট একটা মেলাও বসেছে ; লোকের আনাগোনারও অবধি নেই।

ক্যানেল পার হবার জন্য বড় একটা ব্রীজ, তার ওপরে রয়েছে কাল রং-করা সিমেণ্টের দুটো হাতী। এই হাতীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কজন লোক চন্দন নিয়ে। অসংখ্য লোক সেতু পার হয়ে চলেছেন। সকলের কপালে এঁরা চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে দিচ্ছেন। আনন্দোচ্ছল সস্মিত বদনে পরম আপ্যায়নে ভূষিত করছেন। আমরাও এঁদের আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হলুম না।

ওপারে চলেছে হোলী উৎসবের আধুনিক রূপসজ্জা। মঞ্চে রয়েছেন সভাপতি ও বরেণ্য অতিথিগণ। তাঁদের কেউ দিচ্ছেন মাইকের সাহায্যে বক্তৃতা, কেউ পড়ছেন স্বরচিত কবিতা, কেউ বা করছেন গান। অনেকটা বাংলার বিজয়া সম্মিলনীর উৎসবের অনুরূপ।

নীল ধারা গঙ্গার ঘাটে গেলুম। গঙ্গা এখানে ক্ষীণ তোয়া। বর্ষাকালে এর প্রবল স্ফীতি ঘটে। ক্যানেলে সব জল নেবার ফলে নীলধারা হয়েছেন ক্ষীণ ধারা ; তবুও প্রবল বেগে প্রবাহমানা। গঙ্গার এই নীল ধারাই ভারতের নানা স্থানের বুক বেয়ে বাংলায় এসে সাগরের সঙ্গে মিশে গেছে। এই সাগর সঙ্গমের মুখেই বিখ্যাত কপিল মুনির আশ্রম ; ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের শেষ স্থল।

কনখলে গেলুম। কনখল হরিদ্বার সহরেরই অপরাংশ। মহাসতী এখানেই দেহত্যাগ করেছিলেন। গঙ্গার নীল ধারা এর পাশ দিয়েই বয়ে গেছে। সতীঘাটে আমরা সবাই স্নান করলুম। কোচার ছিল

অসুস্থ, কিন্তু সে কিছুতেই নিষেধ মানল না। সেই জ্বর-গায়েই সে গঙ্গার জলে নেমে পড়ল। বলল, এমন সুযোগ আর জীবনে পাব না।

আশ্চর্য! কোচার নিজে জৈন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু দেখেছি সকল মন্দিরেই ভক্তিতে, প্রেমে, ব্যাকুলতায় সে অধীর হয়ে উঠত। বাপাইয়া ছিল ব্রাহ্ম, অথচ তীর্থক্ষেত্রে দেবদেবী দর্শনে, পূজা দিতে কোন সময়ই তার কোন কুণ্ঠা ছিল না। বললে সে, আজ সতীঘাটে স্নান করে শুধু মাত্র নিজেকেই ধন্য করলুম না, পরন্তু মার আত্মাকেও তৃপ্ত করলুম।

বাপাইয়ার বাবা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু তার মায়ের মনটা ছিল হিন্দু সাকারবাদীর আদর্শে গড়া। মায়ের আদর্শ বাপাইয়ার মনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। একথা বাপাইয়া প্রায়ই আমাকে জানাতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

সতীঘাটে দেখলুম পার্বতী দেবীর মূর্তি এবং অসংখ্য শিবলিঙ্গ। কামেশ্বর মহাদেব ও হনুমানজীর মন্দিরও আছে। পরিবেশটা এমন সুন্দর যে মনের মধ্যে একটা গভীর রেখাপাত করে। পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতিবিজড়িত এই সুপবিত্র তীর্থস্থান মনটাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যায়, যেখানে যুক্তি দিয়ে বিচার চলে না।—হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হয়। দেবাদিদেব মহাদেব এখানে এসে দেখা দেন প্রেমময় অবস্থায়। এখানে সতীর অভাবে তিনি হন আত্মহারা; প্রলয় নাচন নাচনে ব্যাকুল। পার্বতীদেবী প্রতিভাত হন সংহার মূর্তি নিয়ে নয়, প্রেম পরায়ণা, পতি নিন্দায় বিগতপ্রাণা। দেবদেবীর এই লীলা বৈচিত্র্যে মানুষের সঙ্গে যেন একটা নাড়ীর সংযোগের পরিচিতি পাওয়া যায়।

হৃষিকেশ ও লছমনঝোলা

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ মাত্র আট মাইল। রেলপথেও যাবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আমরা রওনা হলুম একটা বাসে। বাসে যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী ; কাজেই এক ঘণ্টা আগে গিয়েই সীট দখল করে বসে থাক্‌তে হল। পর্বতের সানুদেশে হরিদ্বার, তবু মার্চ মাসের শেষভাগেও গরমের তীব্রতা কম নয়।

বাস চলতে লাগল পাহাড় ও উপত্যকা বেয়ে। রাস্তার দুধারে কোথাও বন, কোথাও বা শ্যামল তৃণভূমি। প্রথম অবস্থায় দেখা গেল গঙ্গার নীল জলের রেখা, পরে সেটাও দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। আকাশের গায়ে ঘনকৃষ্ণ মসী চিত্রিত হিমালয়ের শৃঙ্গ শ্রেণী, ঢেউ খেলে চলে গেছে সুদূরে। শৃঙ্গের মাঝে লুকোচুরি খেলছে মেঘের টুকরো, কোন কোন শৃঙ্গকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে মেঘের সমাবেশ, কেমন যেন রহস্যের কুয়াশায় ঘেরা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মত সেটা শোভা পাচ্ছে।

পথে পড়ল সত্যনারায়ণ দেবের মন্দির। বাস থামল এখানে। সব যাত্রী নেমে গেলেন দেবদর্শনে—আমরাও সঙ্গী হলুম। নারায়ণ মূর্তি দর্শন হল। আরও অনেক দেবদেবীর মূর্তি দেখলুম। একটা প্রস্রবণও দেখা গেল, চৌবাচ্ছায় তার জল নিয়তই উঠেছে এবং

একটা পয়ঃপ্রণালী বেয়ে নীচে চলে যাচ্ছে। মন্দিরের গাত্রেই এই প্রস্রবণ।

বাস আবার রওনা হল হৃষীকেশ অভিমুখে। বদরিনাথ কেদার নাথ যাবার পথ এখন অনেকটা সুগম হয়েছে। রুদ্র প্রয়াগ ও পিপলকুঠি পর্যন্ত বাস চলে, এখনও সে পথ খোলা হয়নি। আর একটু গরম পড়লেই পথটায় যানবাহন চলবে, তখন হবে তীর্থ পিপাসু যাত্রীর ভিড়।

হৃষীকেশে ভরত মন্দির দেখলুম। পুরাতন মন্দির। বিগ্রহ রত্ন খচিত। মূল্যবান রত্নগুলিতে আলোর প্রতিফলনে ঝক্ ঝক করে উঠে, ঐশ্বর্যের পরিচিতি জানাতেও কসুর করে না। রামানুজ ভরতের মূর্তি ভারতের আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা জানিনে, কিন্তু ভ্রাতৃবৎসল শ্রীরামের পরম ভক্ত ভরতের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় শুধুমাত্র ভক্তিরই দ্যোতনা জানায় না, পরন্তু আদর্শ নরপতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিচয় জানাতেও দ্বিধা করেনা। পাতালেশ্বর শিব দর্শনও হল।

ত্রিবেণী ঘাটে গঙ্গা স্নানের জন্য গেলুম। গঙ্গার নীলধারা এখানে পাথরের শিলায় ব্যাহত হয়ে প্রবলবেগে ভাসমানা। শুষ্ক ক্ষীণ তোয়া হয়ে যাবার ফলে নদীর ঘাটে খানিকটা পথ অতিক্রম করতে হয়।

আশে পাশে নানা রংএর পাথরের শিলা। বাপাইয়া একটা চকোলেট রংয়ের শিলা কুড়িয়ে নিলে। কোচার সংগ্রহ করল একটা সবুজ শিলা, ওভাল আকৃতির। আমিও রংবেরঙের কতকগুলি শিলা কুড়িয়ে নিলুম। বাপাইয়া বললে, এর উপর তুলি দিয়ে ছবি এঁকে টেবিলে রাখব, হৃষিকেশের একটা চিহ্ন থেকে যাবে।

কথাটা আমার মন্দ লাগল না। দেখেছি মানুষ একটা চিহ্ন রাখতে চায়। এই চিহ্নটা কেউ গেঁথে নিয়ে যায় মনের মধ্যে, কেউ বা বাইরের কোন জিনিষ কিনে বা কুড়িয়ে—প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করবার প্রচেষ্টায়। এর একটা বিপরীত দিকও আছে। মানুষ তার ভ্রমণের চিহ্ন রেখে যেতে যায় নীচতার আশ্রয় নিয়ে, দেয়ালের গায়ে নিজের নাম ঠিকানা লিখে রাখে। চিতোরের ভগ্নস্তূপের দেয়ালে, কুতুব মিনারের গাত্রে, এমনি আরও কত জায়গায় অশোভন কৌতূহলে দর্শক তার ভ্রমণের পরিচিতি জানাবার জন্য নিজেদের নাম ঠিকানা লিখে রেখে গেছেন। এতে প্রাচীর গাত্র হয়েছে কুৎসিত, পরবর্তী দর্শকের মনেও সেটা একটা বিরক্তির উৎপাদনা জানিয়েছে। জাতীয়ভাবোধের ক্ষেত্রে এরূপ অশোভন আচরণ মানসিক দৈন্যের প্রতীক।

গঙ্গার দিকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুন। চারিদিকের শৈল শ্রেণীর বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে নীলধারা ঢেউ তুলে প্রবলভাবে বেয়ে চলেছে গাঙ্গেয় সমতটের দিকে। আপন আনন্দোচ্ছ্বাসে সে মাতোয়ারা। শৈলে শৈলে রেখে যাচ্ছে তার আনন্দের গান। নীল জল কোথাও হয়েছে ফেনময়, কোথাও বা পাথর উপচে উঠে প্রবল উচ্ছ্বাসে রচে নিচ্ছে আপন গমন পথ। চারিদিকে স্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে কলনিনাদীনি গঙ্গার প্রবল উচ্ছ্বাসে চিত্ত আনন্দে ভরপূর হয়।

নদীতটে চেয়ে দেখি শীলাসীন সন্ন্যাসীরা কোথাও গাত্র মার্জনা করছেন, কোথাও বা রয়েছেন নীরব নিস্তব্ধ। ভক্তের সমাবেশও হয়েছে অনেক, কেউ বা পুণ্যতোয়া গঙ্গা জল মাথায় দিচ্ছেন, কেউ করছেন স্নান। কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে স্তোত্র। গঙ্গা প্রেমে বিহ্বল

বিধুর জনসমাবেশ। "গঙ্গা মায়িকী জয়" ধ্বনি জাগায় পুলকের শিহরণ।

হৃষীকেশ ছোট সহর, পাহাড়ের বুকে গড়া। তীর্থকেন্দ্রিক সহর। ছোটখাট ব্যবসায়ও চলে। দোকান-পাট, ধর্মশালা এসবেরও অভাব নেই। বহু আশ্রম, সন্ন্যাসী ও ধর্মপিপাসু নরনারীর আশ্রয়স্থলও। পথ সুগম বলে যাত্রীদের আনাগোনাও অফুরন্ত।

হৃষীকেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। চারিদিকের শৈল শ্রেণীর মধ্যে এই পার্বত্যনিবাস নয়নাভিরাম ও শান্তির উৎস। কর্মক্লান্ত জীবনে নতুন ভাবে প্রেরণা এনে দেয়।

হৃষীকেশ থেকে রওনা হলুম লছমনঝোলার পথে। পাহাড় বেয়ে উঠেছে সে পথ। পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে বাস থামল। হৃষীকেশ থেকে লছমণঝোলা সামান্য পথ মাত্র।

বাস থেকে নেমে আমরা লছমনঝোলার দিকে অগ্রসর হলুম। গাড়ী যাবার উপায় নেই সেখানে। শীর্ষদেশ থেকে আঁকা-বাঁকা পথে ক্রমশঃ নীচে নেমে আসতে লাগলুম। পথে পড়ল অসংখ্য ভিখারী; রাস্তার দু পাশে বসে আর্তনাদ করছে। এদের প্রায় সকলেই অক্ষম; অনেকেই কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ। যাত্রীদের দয়ার উপরেই এদের জীবিকা। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটেও অনেক ভিখারী দেখেছি, কিন্তু লছমনঝোলায় যে অক্ষম, পঙ্গু ও ব্যাধিগ্রস্থ ভিখারী দেখলুম তার তুলনা হয় না। সম্ভবতঃ ধর্মপিপাসু যাত্রীগণ এই সব অক্ষম ভিখারীদের প্রতি খুব করুণাশীল, তাই এরা টিকে রয়েছে।

ভিক্ষার অভাব হলে দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা গেলেও ভিক্ষায় কার্পণ্য কদাচিত মেলে। ভারতের তীর্থস্থান ঘিরেই ভিখারীদের সমাবেশ বেশী। সহরাঞ্চলেও এর অভাব নেই

সত্য, অনেক স্থলে এটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। ভারতবাসী অতিথিপরায়ণ, ভিক্ষুকের প্রতিও দাক্ষিণ্যের অভাব নেই। কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তণ সূচিত হচ্ছে। অক্ষম, পঙ্গু আর ব্যাধিগ্রস্থ ভিক্ষুকদের যেমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সবল, সক্ষম ও ধূর্ত ভিক্ষুকদের কাজে লাগানো। এই জাতীয় দৈন্যের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো দরকার। ভিক্ষা দ্বারা কোন জাতি বড় হতে পারে না, এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

লছমনঝোলার সাঁকো এসে পড়ল। ধারণা ছিল, পাহাড়ের খুব শীর্ষদেশে এই সাঁকো আর জলধারা একেবারে খুব নীচে; শুধু মাত্র একটা ক্ষীণ ধারা সাঁকোর উপর থেকে দেখা যাবে। কিন্তু কাছে এসে সে ভুল ভাঙল। গঙ্গার ধারা সাঁকো থেকে খুব নীচে নয়। মাত্র একশত ফুটের দূরত্ব। অবশ্য সাধারণ সাঁকো থেকে কিছু উঁচু এই সাঁকো।

গঙ্গা এখানে পাহাড় ভেদ করে প্রবাহমানা। দু ধারে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মত খাড়া পাহাড়। এই পাহাড়ের গায়েই ঝোলানো সেতু, হাওড়ার সেতুর একটা ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। দু ধারে পাহাড়ের গায়ে মোটা শিকল দিয়ে সেতু আটকানো। সেতুটি স্বল্প পরিসর। মাত্র ৬।৭ ফুট চওড়া, রাস্তাও সিকি ফার্লং মত চওড়া—মানুষের চলবার পথ। একজন লোক সাইকেলে সেতুটি পার হচ্ছিলেন, আমরা পথে পড়ায় তাঁকে নামতে হল। আমরা পাশ কেটে দাঁড়ালুম, তবু সুষ্ঠু ভাবে সাইকেল চালানোর মত রাস্তা থাকল না। মালবাহী অশ্ব স্বচ্ছন্দে পার হতে দেখলুম। সেতুর ঠিক মাঝখানে এলে ঈষৎ কম্পন অনুভূত হয়।

গঙ্গার দুপাশে বাড়ীঘর আর মন্দির। আসবার পথে অনেক

দেবমন্দির দেখে এসেছি। সেতুর পাশেই লক্ষ্মণ দেবের মন্দির। এ থেকেই সেতুর নাম হয়েছে লছমনঝোলা।

সেতু পার হয়ে দেখলুম সীতামন্দির ও সন্ত সেবাশ্রম। বালগোপালের মন্দিরও আছে।

লছমনঝোলায় একটা পোষ্ট অফিস আছে। পোষ্ট অফিসের কাছে একটা মন্দির। এখানে নানা দেবদেবীর সমাবেশ। হরপার্বতী, কৃষ্ণরাধিকা, রামসীতা এসব দর্শন করলুম। দেয়াল গাত্রেও সুন্দর চিত্র। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি সুন্দরভাবে চিত্রিত।

সুললিত সুরে কীর্তন চলছিল। আমরা কীর্তনীয়াদের পাশে বসে পড়লুম। পরিবেশের কল্যাণে কীর্তন মধুর মনে হল।

লছমনঝোলার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর সৌন্দর্য। তাজমহল, কুতুবমিনার, রেডফোর্ট, আগ্রাদূর্গ, অম্বর প্রাসাদ, চিতোরদুর্গ, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানও সুন্দর। ইতিহাসের স্মৃতি আর ঐশ্বর্যের সমাবেশে এদের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। প্রাচীন যুগের কীর্তি ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয়ে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়েছি। উদয়পুরের শৈলশ্রেণীর বেষ্টনীতে সুদীর্ঘ ফতেসাগর, পিচোলা, রাজসমুন্দের জ্যোৎস্না স্নাত হ্রদ ইত্যাদি দেখেও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়েছি। কিন্তু লছমন-ঝোলার এই সৌন্দর্য সেই দৃষ্টিভঙ্গীর বাইরের জিনিস। এ যেন ঠিক অন্তরের মাঝে বিপুল একটা সাড়া জাগায়।

কোথা থেকে আমি এসেছি, কে আমায় পাঠিয়েছে, এসব প্রশ্নের কিছুই আমি জানিনে, জানবার উপায়ও নেই। সংসারের কোলাহলময় পরিবেশে এসব প্রশ্ন সহসা উদয়ও হয় না। এই শান্ত গম্ভীর পরিবেশে আমার অন্তর চৈতন্য জানিয়ে দেয়, এসবের কি যেন একটা উদ্দেশ্য আছে। অজয় অমর আত্মা আবার সেই মূল উৎসকেন্দ্র চিন্ময়

শক্তিতেই ফিরে যাবে। কিন্তু যাবার একটা পথ আছে, সে পথের রূপটা কি?

হিন্দুধর্ম আর সংস্কৃতির ইতিহাস জানিয়ে দেয় এই লছমনঝোলার পথ পার হয়েই সে পথের সন্ধানে যুগ যুগ ধরে গেছেন কত মহামানব। কেউ বা আপন সত্ত্বার বিকাশে বিভোর হয়ে চিন্ময় চৈতন্যে লোপ হয়েছেন, কেউ বা ফিরে এসে জানিয়েছেন বিশ্ববাসীকে অমৃতের স্বরূপ, সত্যশিব ও সুন্দরের পরিচয়। দৈনন্দিন জীবনের শত প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত হয়েছে বিকল, বস্তুতান্ত্রিক আহ্বানে ভোগের পরিচিতির মাঝে মানুষ তার সুখের সন্ধান পায়নি, ক্রম-বর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা সাফল্যের মধ্যেই এনে দিয়েছে তীব্র অসন্তোষ, তাই মানুষ ব্যাকুল নয়নে চেয়ে থাকে, জানতে চায় কোথায় সে শান্তির পথ। শান্তির আধার যদি হয় মন, তাহলে সেই মনটাকেই উদ্ভাসিত করে শান্তির নীড়ে পরিণত করা যায় কিভাবে। তাই তীব্র ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে কেউ চলে আসেন এই হিমালয়ের পাদমূলে শান্তির প্রত্যাশায়, কেউ বা ভোগের চরমসীমায় অধিষ্ঠিত হয়ে আনন্দের সন্ধান না পেয়ে নিশ্চল মনে অসীম দুঃখ বহন করে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ফেলেন।

বিশ্বকবি বলেছেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।'

কিন্তু বন্ধনের মধ্যে মুক্তির সন্ধান, অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের পরিচিতি, ভোগের মধ্যে ত্যাগের আস্বাদ, কর্মের মধ্যে কর্মফলে অনাশক্তি কজনের মনে ধরা দেয়! যাদেয় ধরা দেয়, তাদের মন পার্থিব গণ্ডীর অনেক উর্ধ্বে চলে যায়। কাদার মধ্যে বাস করে পাঁকাল মাছের মত কাদা না মাখিয়ে থাকতে পারে পৃথিবীর কয়জন?

তাই লছমনঝোলার এই অপরূপ সৌন্দর্য, সুষমামণ্ডিত শৈল সমারোহ, কলনিনাদিনী গঙ্গার নীল ধারার প্রবাহ, আকাশের লঘুমেঘ, সর্বোপরি শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ মনটায় যেন অপরূপ ভাবে ধরা দেয়। জীবনের অপরাহ্ণে কবে চলে যাবার ডাক আসে তার ঠিকানা নেই। কর্মবহুল জীবনের হিসাব নিকাশের তাই একটা খতিয়ান প্রয়োজন। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির সোপানের পরিচিতি কিভাবে পাওয়া যায়, তাতো জানবার অবকাশ সহসা ঘটে উঠে না। শক্তির প্রাবল্য যখন দেহ মনে ব্যাপ্ত, তখন তার অপচয় ঘটাতে কোন কুণ্ঠাবোধ হয় না, তাই বিদায় বেলায় শক্তিহীন মন নিয়ে সত্যশিব আর সুন্দরের সাধনার সুযোগ কোথায়!

মন্দিরের দেউলে একটা শিলাখণ্ডে বসে ভাবছিলুম। বাপাইয়া এসে জানাল, এই গরমের মধ্যে কোচার জ্বর গায়েই স্নান করছে। বড় একটা অসুখে পড়তে পারে।

সন্দেহ নেই, গ্রীষ্মের প্রকোপটাও বেশ পড়েছে। ছায়ায় বসেই গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। এই অবস্থায় অসুস্থ শরীর নিয়ে স্নান করলে অসুখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কোচার মনের ভিতর যে প্রেরণা পাচ্ছে তাতে বাধা দিলে ক্ষুণ্ণ হবে, নিষেধও মানবে না। কাজেই চুপ করে রইলুম।

লছমনঝোলার অপর পারে রাস্তা চলে গেছে স্বর্গাশ্রমে। এক মাইল পথ অতিক্রম করলে তার সন্ধান মেলে। আমরা সেই পথেই চলেছি। রাস্তার দুধারে গাছ, কতকগুলো ফলের গাছও দেখলুম। আমাদের সঙ্গে আরও দুচারজন যাত্রী ছিল। অরণ্যের মধ্য দিয়েই সে পথ।

অর্ধেক পথ এগিয়ে যেতেই সামনে পড়ল বড় একটা গাছ; আর সেই গাছের তলায় নিস্তব্ধ পবিবেশে বসে আছেন একজন সাধু।

শুধু সাধু বললে সবটা বলা হয় না, দেখলুম একজন ধ্যান সমাধিমগ্ন যোগী। একটা আসনে তিনি নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। প্রথমটা দেখলেই মনে হয় মৃত। সর্বাঙ্গ কাপড়ে মোড়া, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, হাত দুটো হাটুর উপরে ন্যস্ত। চোখ মেলে চেয়ে রয়েছেন কিন্তু তাতে পলক নেই। চোখের উপর মাছি পড়ছে, কিন্তু তাতেও ভ্রুক্ষেপ নেই, চোখের পাতা নিশ্চল। গলা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলুম, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেলনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও জীবনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলুম না। শুধু মাত্র মনে হতে লাগল যেন একটা মৃত দেহকে কোনমতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। কোনরকম নড়া চড়া নেই, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন দেহ নিয়ে শুধু একটা প্রস্তরখণ্ডের মত তিনি স্থির হয়ে বসে রয়েছেন। অথচ মুখমণ্ডলে প্রতীয়মান হচ্ছে একটা জ্যোতির রেখা, বদনে প্রশান্তি ও সৌম্যভাব।

সকলেই নিশ্চল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা প্রণতি জানিয়ে দূরে সরে এলুম। কেউ বললেন, ইনি নির্বিকার সমাধি প্রাপ্ত হয়েছেন : কেউ জানালেন, খেচরী মুদ্রায় আছেন। স্থানীয় লোক জানাল, ইনি প্রায়ই এরূপ অবস্থাতেই থাকেন।

বার বার মনে হতে লাগল এ কী দেখলুম। অথচ এই গঙ্গা তীরেই শীলাসীন অবস্থায় যে সব এলোমেলো চিন্তাধারা আমার মনে এসে দানা বাঁধছিল, তাতে এমন একজন সন্ন্যাসীর দর্শন কামনাতেই মন অধীর হয়ে উঠেছিল। অথচ দর্শন যখন প্রকৃতই হল তখন যা জানবার ছিল, তার কিছুতেই জানতে পারলুম না। বরঞ্চ সভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দূরেই সরে রইলুম!

সংসারের জ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মানুষ অনেক সময় মরণ কামনা করে, কিন্তু মরণ যখন সত্যই তার সামনে এসে ধরা দেবার চেষ্টা করে তখন বাঁচবার চেষ্টায় সে অধীর হয়। আমরা নিজে কি চাই, তাই আমরা জানিনে। তাই অস্থির মন চঞ্চলতার সুযোগে মানুষের মনে অশান্তির বীজই বপন করে।

সেবাশ্রমের দিকে এগিয়ে চললুম। সামনে পড়ল একটা চায়ের দোকান। রাও বললে, এক কাপ চা পান না করে আর চলা যাচ্ছে না।

চা তৈরী হল। দুধের পরিমাণ এত কম আর এত কড়া চা যে মুখে দেওয়া চলে না। কাজেই অতিরিক্ত খানিকটা দুধ নেওয়া হল। দোকানী তাতে তিনগুণ চায়ের দাম হেঁকে বসল। মিশ্র আর কোচার তাতে নানারকম বিতর্কের অবতারণা করল, কিন্তু তাতে দোকানী দাম ছাড়তে রাজী হল না। অগত্যা অধিক দক্ষিণা দিয়েই বিদায় নিতে হল।

বাবা কালী কমলীওয়ালায় আশ্রম দেখলুম। সৎকার্যে এই সন্ন্যাসীর কীর্তির অবধি নেই। তীর্থ যাত্রীদের সেবার জন্য সব জায়গায় সুবন্দোবস্ত এঁরই কল্যাণে ঘটে থাকে।

খানিকটা নীচে নেমে এসে একটা আট নম্বর অবধূত স্বামী আত্মপ্রকাশজীর সমাধি দেখলুম। সুন্দর পরিবেশের মধ্যে এই সমাধি মন্দির।

কামেশ্বর মহাদেবের মন্দির গঙ্গার ধারেই। প্রাচীন মন্দির এটী। সুন্দর চূড়া সমন্বিত সুদৃশ্য মন্দিরটি স্বর্গাশ্রম থেকে নেমে এলেই গঙ্গার ধারে দেখতে পাওয়া যায়।

গঙ্গার ধারে গীতাভবন। এর পাশেই দেবী সম্পদ মহামণ্ডল। সুন্দর ভবন। লছমনঝোলার দর্শণীয় বস্তুদের অন্যতম।

খেয়া পার হয়ে এপারে এলুম। এবার ফেরবার পালা। গঙ্গার নীল ধারা থেকে এক অঞ্জলি জল তুলে নিয়ে মাথায় দিলুম।

পাহাড় বেয়ে আবার শীর্ষদেশে এসে উপস্থিত হলুম। চারিদিকে শান্ত সমাহিত পরিবেশ। শহরের কোলাহল হতে দূরে এই সুদৃশ্য সমন্বিত পরিবেশে মনটা যেন কোন অজানা লোকে নিয়ে যায়।

গঙ্গার নীলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে কুল কুল শব্দে বেয়ে যাচ্ছে; পাহাড়ের বুক বেয়ে উঠেছে ঘন বনানী, দূরে আকাশের গায়ে ভেসে আছে উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গশ্রেণী। নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ খেলা করছে। পাহাড়ের বুকেও তার খেলার অবধি নেই। নীচে সরীসৃপের মত নেমে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকা বাঁকা, পথ, স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন গভীর বিশাল হিমালয়। সবটাই যেন অপূর্ব সমাবেশ, শুধুমাত্র শোভা মণ্ডিত হয়নি, পরন্তু মনটাকেও সুন্দর একটা দোলা জানাচ্ছে। চারিদেকের সৌন্দর্য হৃদয়ের সঙ্গে অনুভূতির স্পর্শসহ গ্রহণ করলে স্বতঃই উৎসারিত হয়ে উঠে নিজের সত্বার একটা ক্ষীণ পরিচিতি। আত্মোপলব্ধির ক্ষণিক বিকাশ। বিদায় বেলায় তাই এই বিপুল সৌন্দর্যকে জানালুম অন্তরের অভিনন্দন।

পথের একটা মোহ আছে। বাইরের জগৎকে সে নিকটে টেনে আনে। অন্তরটার বিকাশের পথ রচনা করতে দেয়। পথে বের হলে তাই মনে হয়, এপথের যেন অবধি নেই। জানবারও যেন শেষ নেই! নতুন নতুন পরিবেশ নিত্য নতুনভাবে এসে ধরা দেয়। কাজেই পথিক যখন ভাবে এই তার পথ শেষ হল, তখন সবে

হয় তার আরম্ভ। তাই পথের যবনিকা পতন সমাপ্তির পরিচিতি নয়, দৃশ্যান্তর গ্রহণের প্রারম্ভিক ছেদ মাত্র। চলতে আরম্ভ করলে মানুষ থামতে চায় না। থামাটা তার সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। চলা বন্ধ হলেও মনটা চলতেই থাকে। দেহের বাঁধন ডিঙিয়ে মনটা চলার পথ ঠিক করে নেয়। এমনি দুর্বার আকর্ষণ পথের ডাকের।

পথে দাঁড়িয়ে তাই মনে হল, জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশে নিজের দৈনন্দিন ভ্রমণের গণ্ডীর বাইরে চলতে এসে কি পাথেয় পেলুম। পথ আমায় ডেকে নিয়ে এল। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে কিছুটা নতুন জগৎ আমার সামনে তুলে ধরল। দেখাল তার রূপ। দিল তার পরিচয়। অন্তর দিয়ে তাকে অভিষেক করবার সুযোগ দিল। মহাকালের সময়ের খতিয়ানে জীবনের অংশটা অতি ক্ষুদ্র। তারই একটা ক্ষুদ্রতম অংশে পথ আমায় নিয়ে এল এক অপূর্ব আনন্দলোকে। সেটা সাময়িক হলেও চিরন্তনের পরিচিতি জানাতে কসুর করল না। তাই তাজমহলের সৌন্দর্য ও প্রেমে, কুতুবমিনারের বিশালতায়, চিতোর, আগ্রা আর লালকেল্লার দুর্ভেদ্যতায়, উদয়পুরের শৈলসমন্বিত সাগরসমূহের সৌন্দর্যে আর সর্বোপরি সুপ্রাচীন দেবদেবী দর্শন ও তীর্থস্থানের সুপবিত্রতায় এবং হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর সাধনা পীঠের পাদমূলে মনের মধ্যে যে গভীর রেখাপাত হয়, তার তুলনা নেই।

সমাপ্ত

লেখক

পথ আমায় ডাকে

দিল্লী

হাওড়া ষ্টেশন থেকে দিল্লী একস্প্রেসে রওনা হলুম দিল্লীর পথে। টিকিট কিনতে হয়েছিল অনেক দেরীতে, কাজেই দ্রুতগামী অন্য গাড়ীতে স্থান পাওয়া গেল না। এগাড়ী যাবে খানিকটা ঘুরে একটু বিলম্বিত পথে. এতেও স্থান সঙ্কুলান কঠিন, প্রথমে নামটা রইল ওয়েটিং লিষ্টে, পরে অবশ্য উপরের বার্থে একটা জায়গা পাওয়া গেল।

গাড়ী চলতে লাগল অবিরাম গতিতে। বাইরে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তার রূপালী পর্দ্দায় অপস্রয়মান গাছগুলো, ঘরবাড়ী, প্রান্তর চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার দূরে সরে যেতে লাগল। আকাশে ইতস্ততঃ ভাসমান খণ্ড খণ্ড লঘু মেঘ, প্রান্তরে শ্যামল বৃক্ষরাজির ঘনকৃষ্ণ মসীরেখার প্রলেপ. পৃথিবীর বুক জুড়ে শান্ত স্নিগ্ধ ও শুভ্র জোৎস্নার অফুরন্ত আলোর বিকীরণ, সুদূরগামী বাস্পীয় যানের অবিরাম ঘর্ঘরধ্বনি ও কুণ্ডলীকৃত ধূম উদগীরণ, আর গাড়ীর অভ্যন্তরে বিপুল লটবহর ও মেদবহুল দেহ নিয়ে এক সহযাত্রী দম্পতির অনর্গল বৈষয়িক ভাষণ একটা নতুন পরিবেশ সৃজন করছিল।

নভেম্বর মাস, শীতের আমেজটা বেশ নেমে এসেছে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জানালার ধারে বসে রইলুম আপন মনে। ইতিমধ্যে সহযাত্রীদ্বয়ের নাসিকা গর্জন প্রবল ভাবে শুরু হয়েছে। অগত্যা লেপের তলায় এসে আমাকেও আশ্রয় নিতে হল, কিন্তু ঘুম এলনা।

একদিন আর দুরাত্রি কাটিয়ে প্রত্যুষে এসে পড়লুম দিল্লী ষ্টেশনে। দিল্লী জংসন ষ্টেশনটা বড়, কুলীর মাথায় নিজের সংক্ষিপ্ত লটবহর চাপিয়ে একটা স্কুটার ভাড়া করলুম। দিল্লীর পথে যাতায়াতে এইটাই সস্তার বাহন।

দিল্লী, ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান রাজধানী। পাঁচ হাজার বছর আগে পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল এই দিল্লী। ইন্দ্রপ্রস্থ নামই তার পরিচিতি, তদানীন্তন ইঞ্জিনিয়ার ময়দানবের সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল অতুল বৈভবে মহীয়ান, কুরুরাজ দুর্যোধনও যে ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়েছিলেন। এখন আর সে ইন্দ্রপ্রস্থ সহরের কোন চিহ্নমাত্র নেই। সে স্থান জুড়ে রয়েছে পুরানো কেল্লা, মোগল বাদশা হুমায়ুন আর পাঠান বাদশাহ শেরশাহ ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ সাল পর্যন্ত সে কেল্লা রচনা করেছিলেন। এখন রয়েছে তার ভগ্নস্তূপ। প্রাচীন ভারতের কোন চিহ্ন নেই, শুধু মধ্যযুগের কেল্লার এই ভগ্নস্তূপ আর "ইন্দ্রপ্রস্থ মার্গ" পথের নামকরণ প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে। স্কুটারে সঞ্চরণশীল দৃষ্টিপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণীর মাঝে এই ভগ্নস্তূপটাই চোখের সামনে ধরা দিল।

দিল্লীতে চলছে "ভারত—১৯৫৮" প্রদর্শনী। তাই লোকের আনা গোনার অবধি নেই। স্থায়ীভাবে প্রদর্শনী যাতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হতে পারে, তারজন্য অনেকটা অংশ জুড়ে বিপুলভাবে চলেছে

এই প্রদর্শনীর আয়োজন। রোজ হাজার হাজার লোক আস্‌ছে ভারতের নানা স্থান থেকে।

দিল্লীতে কাটাতে হবে কয়েক মাস, এবং একেই কেন্দ্র করে উত্তর ভারত পরিক্রমা করব স্থির করলুম।

প্রদর্শনীতে একদিন গেলুম। বড় বড় ছুটি গেট চোখের সামনে পড়ল। দর্শনী চার আনা জমা দিয়ে একটা টিকেট কেটে ঢুকে পড়লুম। আয়োজন বিরাট ও ব্যাপক। খুব তাড়াতাড়ি দেখলেও একদিনে এই প্রদর্শনীর অনেক জিনিষই দেখা যায়না। সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপক পরিচিতির ক্ষেত্র! প্রদর্শনী দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত কেমনভাবে দ্রুততর উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ষ্টল খোলা হয়েছিল। কুটীরশিল্পের ষ্টলগুলি চিত্তাকর্ষক। বাংলারও একটা ষ্টল ছিল, বিভিন্ন কুটীর শিল্পের পরিচয় ছিল তাতে।

দিল্লীর নাশন্যাল ষ্টাডিয়মটা বেশ বড়, আয়োজনও বিপুল। দশ হাজারেরও অধিক দর্শক এখানে আসন পেতে পারে। একদিন সেখানে আন্তঃরাজ্য বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখলুম। রাষ্ট্রপতি প্রথম দিনে উদ্বোধন করেন, শেষ দিনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। পুরস্কারের শীর্ষদেশে ছিল পাঞ্জাব। পশ্চিম বাংলাও একটা পুরস্কার পেয়েছিল। স্কুলের ছেলে মেয়েদের সমবেত শরীর চর্চা নৃত্যের ছন্দ মনোজ্ঞ ও শৃঙ্খলা বোধের পরিচায়ক ছিল।

বিজ্ঞান ভবনে ছিলুম ছুদিন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক রূপ-সজ্জায় সুদৃশ্য হল। হাজার খানেক লোকের বসবার আসন আছে এখানে। মেঝেতে পুরু গালিচা পাতা গ্যালারী বিন্যাসও

সুন্দর। পুরু আসন, ও অনেক আসনের সঙ্গে হেড ফোনের ব্যবস্থা। উপর থেকে ফ্লোরেসেন্ট আলোরা ঝরণা এসে ঘরটাকে আলোময় করে তোলে। স্বপ্নপুরীর মত পরিবেশ। একদিন বক্তৃতা দিলেন বিহারের রাজ্যপাল ডাঃ জাকির হোসেন শিক্ষা সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে, আর একদিন ভাষণ পাঠকরলেন প্রধান মন্ত্রী ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ সম্বন্ধে। দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতা আজাদ স্মৃতি সংঘের ব্যবস্থাপনায় টিকিট করে শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল।

দিল্লী করপোরেশনে গেছলুম দুদিন। সামাজিক শিক্ষা উৎসবে বক্তৃতার আয়োজন হয়ে ছিল। একদিবস বক্তৃতা দিলেন মেয়র শ্রীমতী অরুণাআসফ আলী, আর একদিন দিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর শ্রীমালী।

দিল্লী শহরটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলুম। শহরটা ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। আয়তনটা অনেক বড়, কিন্তু কেমন যেন এলো মেলো। বিশ বছর আগের রূপ দিয়ে বর্তমানের বিচার চলবে না। এখন মূল শহরকে কেন্দ্র করে চারি দিকে নতুন নতুন কলোণী গড়ে উঠেছে। রাস্তাগুলো উঁচু নীচু একটা কলোনী থেকে আর একটার ব্যবধানের দুরত্ব কম নয়। মাঝে মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। হয়ত কালক্রমে এসব জায়গা ভরে উঠবে, এখনি তার সূচনা দেখা দিচ্ছে।

সারা শহরটা জুড়েই ভগ্নস্তূপ। এর প্রত্যেকটাই প্রাচীন পূরাকীর্তি হিসাবে রক্ষিত হচ্ছে। এর কোনটা কি ছিল, তা ঐইতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়, বাইরের লোকের বোঝাবার সম্ভাবনা কম। কোন কোনটায় সরকারীভাবে পরিচিতি জানানো রয়েছে, অনেক গুলোতেই তা নেই। কোন কোন ভগ্ন স্তূপ লুপ্ত হয়ে তার উপর উঠে পড়েছে ঘরবাড়ী। মসজিদেরও অন্ত নেই। প্রাচীন রাজধানী,

তাই পুরাকীর্তির ও অবধি নেই। মনে হয় একজন ঐতিহাসিক দীর্ঘ কাল এর তত্ত্ব অনুশালন করেও এর হদিস পাবেন না। অনুশীলন হয়ত অনুমানে পর্যবসিত হবে, কেন না এত অখ্যাত অজ্ঞাত স্তূপের সমাবেশ তার উপর মানুষের চেষ্টায় তার বিলুপ্তি ঘটানোতে লুপ্ত ইতিহাস সন্ধানের পক্ষে প্রতিকূল হয়েই দাঁড়াবে।

কুতুব মিনার দেখলুম। সুউচ্চ পাঁচতলা স্তম্ভ। গোলাকৃতি এই স্তম্ভের দেয়াল গঠন করা হয়েছে ত্রিকোণাকৃতি পাথরে। লাল পাথরের এই অত্যুচ্চ স্তম্ভটি নানা কারুকার্যশোভিত। আরবী অক্ষর ও লতাপাতা আঁকা রয়েছে তাতে। স্তম্ভের ভিতর দিয়ে সর্পাকৃতি সিঁড়ি শীর্ষদেশ পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রত্যেক তলার উপরে ঘেরা বারান্দা, দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে সারা দিল্লীর শোভা দেখতে পাওয়া যায়। বারান্দাগুলিও পাথরের ও তার উপর নানা কারুকার্য।

কুতুব মিনারের ইতিহাসও বিচিত্র। হিন্দু রাজা পৃথীরাজ তৈরি করেন এর প্রথম তালা বিজয় স্তম্ভের প্রতীক হিসাবে। এই তালাটিকে মুসলিম স্থাপত্যের রূপ দেন কুতুবউদ্দীন আইবেক ১২০০ খৃষ্টাব্দে। এর পরে আলতামাস ১২১০ সাল থেকে এর উপরের তালার কাজ শুরু করেন। এর বর্তমান রূপায়ন করেন ফিরোজ শা তোগলক। ১৩৫১ সাল থেকে ১৩৮৮ সাল পর্যন্ত এর রূপদানের কাজ চলে। আজও এটা অটুট থেকে সারা পৃথিবীর লোককে আকর্ষণ করছে।

এর উচ্চতাও কম নয়, ২৫৬ ফুট। কিন্তু শীর্ষদেশ পর্যন্ত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও উঠতে পারে। অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠতে গিয়ে প্রথম তলায় উঠেই হাঁপিয়ে উঠলুম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিল্লী শহরটার শোভা চোখের সামনে ফুটে উঠল। আরও উপরে

হয়ত দৃশ্যটা অধিকতর মনোরম হয়ে দেখা দিত, কিন্তু অসুস্থতার জন্য সাহসী হলুম না।

কুতুবমিনারের পাশেই আলাইদরজা ও তার পাশে একটা ছোট মসজিদ। আলাই দরজাটি খুব উঁচু, ভেতরে সুন্দর একটা গম্বুজ। লাল পাথরের উপর সুন্দর কারুকার্য। এটা কুয়াতুল মসজিদের গেট। নির্মাণ করেছিলেন খিলজি বংশের দ্বিতীয় নরপতি ১৩৫১ সালে।

কুতুবমিনারের নিকটেই একটা লৌহস্তম্ভ আছে। চতুর্থ শতাব্দীতে একজন হিন্দু নরপতি এটা নির্মাণ করান। এর উচ্চতা ৩২ ফুট ৮ ইঞ্চি ও পরিধি নীচে ১৬॥ ইঞ্চি, উপরে ১২॥ ইঞ্চি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে গঠন করা হয় এই লৌহস্তম্ভ। আশ্চর্যের বিষয় দীর্ঘ ষোল শত বছর ধরেও এই লৌহস্তম্ভ এখনও অটুট রয়েছে, একটুও মরিচা পড়েনি তাতে। প্রাচীন কালে কি ভাবে মরিচা-বিহীন লৌহস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভবপর হয়েছিল, চিন্তা করলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের উন্নতির চরমতম নিদর্শন এটা।

প্রবাদ আছে, এই লৌহ স্তম্ভকে পিছনে হাত দিয়ে বেষ্টন করলে সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়; এবং এই সৌভাগ্যলাভের চেষ্টায় অনেকেই পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে বেষ্টন করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, দেখলুম। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, দীর্ঘ হাত দুটো পিছনে বাড়িয়ে দিয়ে অনায়াসেই এটা বেষ্টন করতে সক্ষম হলুম।

কুতুবমিনারের আশে পাশে অজস্র ভগ্ন গৃহ রয়েছে। পাঠান যুগের বড় বড় পাথরের প্রাচীর, ঘর আর মসজিদ। এর কোন কোনটি

অর্ধ-ভগ্ন, কোনটার শুধু স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে, অনেকগুলোই ভেঙ্গে চুরে স্তূপাকার হয়ে আছে। চারিদিকে ভাঙ্গা প্রাচীরের বেষ্টন।

বন্ধের দিনে অনেকে এখানে আসেন পিকনিক করতে। আনন্দের হুল্লোড়ও লেগে যায় তাতে। দেখলুম, মিনারের পাশে একটি লনে এমনি একটা আনন্দের আতিশয্য। বিরাট গুম্ফসমন্বিত একটি যুবক শাড়ী পরে ওড়না দুলিয়ে তাণ্ডব নৃত্য আর চিঁ-চিঁ সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, অর্ধ শতাধিক সঙ্গীর দল তাকে "মার হাব্বা" জানিয়ে বাহবা দিচ্ছেন।

নিকটবর্তী মেহেরলি গ্রামে গেলুম। এখানে একটা ছোট মসজিদ আছে। পুরানো মসজিদ, তবে যত্নরক্ষিত। সরকার পরিচালিত একটি সাধারণ পাঠাগার ও তৎসংলগ্ন সমাজশিক্ষার অফিসও দেখলুম। পাঠক সংখ্যার অধিকাংশই দেখলুম চাকুরে।

গান্ধী সমাধি দর্শনে গেলুম। রাজঘাটের পরিবেশ শান্তসমাহিত। গেটের পাশে জুতো খুলে রেখে সমাধি-প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লুম। চারিদিক ঘেরা, মাঝখানে একটা বেদী, বেদীর ওপর অজস্র ফুল। আড়ম্বরের বাহুল্য নেই। বেদীর বাইরে বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত্র ঘাসে ভরা, সুন্দর বিন্যাস। অদূরে যমুনা নদী কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাই স্নিগ্ধ ও শুচিতায় ভরা। দেখলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়।

এখানেই আসেন পৃথিবীর নানা দেশের গণমান্য লোক। শান্ত শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে তাঁরা বেদীর উপরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এই দিল্লীতেই মহামানব নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। অথচ তিনি শত্রুকেও মিত্রভাবে দেখতেন! মহামানবের এই স্মারকচিহ্ন সমস্ত জাতির শ্রদ্ধার প্রতীক।

ওকলায় গেলুম বেড়াতে। কলকাতার লেক অঞ্চলের মতো দিল্লীরও বেড়াবার স্থান এই ওকলা। যমুনার উপরে বাঁধ দিয়ে জল সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধটা দেখবার জিনিস, সারা নদীটাই বাঁধ দিয়ে ঘেরা। শিশুদের খেলবার একটা বাগানও এখানে আছে। স্থানটি সুদৃশ্য ও মনোরম। প্রত্যহ বহুলোক এখানে বেড়াতে আসেন।

বানরের উৎপাতও কম নয়। এদের জন্য চীনাবাদাম কিনে নিয়ে গেছলুম। পথ আগ্‌লে ধরলে দু'চারটে চীনাবাদাম ছড়িয়ে দিতে হয়। বাদামের লোভে এরা বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পিছু পিছু ধাওয়া করে এল।

তোগলকাবাদ একদিন দেখলুম। ফিরোজশাহ তোগলক ছিলেন দিল্লীর সম্রাট। দিল্লীর অনেক প্রাসাদ তাঁর আমলেই নির্মিত হয়। তোগলকাবাদ ছিল তাঁর রাজধানী। বিরাট প্রাচীরের অভ্যন্তরে ছিল তাঁর দুর্গ। এখন তার প্রায় সবটাই ভেঙ্গে চুরে গেছে। শুধু মসজিদ আর দুই-একটা ঘর সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। দিল্লী স্টেশন থেকে নেমে প্রায় তের মাইল দূরে এই ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রপতি ভবনে একদিন গেলুম। এর সামনে সরকারী অফিস। এই সুন্দর ভবনের নীচে আছে একটা ছোট মিউজিয়াম। প্রাসাদ সংলগ্ন মোগল উদ্যানটিও দেখবার জিনিস। ফেব্রুয়ারী মাসে এই উদ্যান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। নানা রকম রঙ্গীন ফুলে ভরা এই উদ্যান। তাছাড়া ফোয়ারা ঝিল ও সবুজ প্রান্তর উদ্যানের শোভা বর্ধন করে।

কাছেই পার্লিয়ামেণ্ট হাউস। এই গোলাকৃতি ভবনটি পৃথিবীর

মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্লিয়ামেন্ট ভবন। এখানে রাজ্যসভা ও লোকসভা দুটোরই অধিবেশন বসে।

এই ভবনেব উত্তর-পূর্বে অল-ইণ্ডিয়া রেডিও ভবন। এই সর্ব ভারতীয় আকাশবাণী কেন্দ্রটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রেডিও স্টেশন-গুলির অন্যতম। ভবনটি সুদৃশ্য এবং দিল্লীর দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম।

শহরের মাঝখানে ইণ্ডিয়া গেট। এই উচ্চ স্তম্ভটি প্রথম মহা যুদ্ধের মৃত সৈনিকদের স্মারকচিহ্ন। এর পাশে আছে পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জের দীর্ঘ মূর্তি। একটা কৃত্রিম জলাশয় সবটাকে বেষ্টন করে রয়েছে। গেটটি দর্শনীয়।

জুম্মা মসজিদটি দেখলুম। লালকেল্লার পাশেই এই মসজিদ। বেশ বড়। লাল পাথর আর সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি এই মসজিদ এখনও সুন্দরভাবে চালু আছে। ১৬৫৩ সালে সম্রাট শাহজাহান দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। ভারতের সমস্ত মসজিদের মধ্যে এটাই বৃহত্তম। মসজিদগুলি সবই এক ধাঁচে গড়া। মসজিদের ভিতরের দেয়ালে কোরাণ শরীফ লেখা রয়েছে। মিনারগুলিও খুব সুন্দর।

লালকেল্লা গেলুম। প্রাচীন ঐতিহ্যজড়িত এই লালকেল্লা। এরই কথা স্মরণ করে আজাদ হিন্দ ফৌজের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল "ঝাণ্ডা তিরঙ্গা লাল কিলে মৈ উড়ায়েঙ্গে" সে স্বপ্ন হয়েছে সফল, এখন লালকেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। সম্রাট শাহজাহান এই বিরাট দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং এতে ব্যয় হয়েছিল সব সমেত নয় কোটি টাকা। মোগল স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন এটা।

এর গঠনের ইতিহাসও বিচিত্র। আগ্রা দুর্গে দীর্ঘ এগার বছর বাস করার পর গ্রীষ্মাধিক্য সহ্য না করতে পেরে সম্রাট শাহজাহান দিল্লীর যমুনাতীরে এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করেন। জাঁকজমকের সঙ্গে সম্রাট প্রবেশ করেন এই দুর্গে। রাজপ্রসাদ করা হয় সুশোভিত যুবরাজ দারা সেকো স্বর্ন ও রৌপ্য মুদ্রা ছড়াতে থাকেন। সারা প্রাসাদটা মোড়া হল কার্পেট বিছিয়ে, ঘরে ঘরে ঝুলতে লাগল সোনালী সিল্কের পরদা সম্রাট সাহজাহান এসে বসলেন দেওয়ান-ই-আমের সিংহাসনে।

ফার্গুসন বর্ণনা করেছেন, প্রাচ্যের সবচেয়ে সুন্দর এই দুর্গ, হয়ত বা পৃথিবীর মধ্যেও সেরা।

কিন্তু ইতিহাস উত্থান পতন নিয়েই চলে। তাই দুর্বিপাকের তাড়নায় সম্রাট নিজেই আমরণ বন্দী হয়ে রইলেন আগ্রার দুর্গে, আর এই বিপর্যয় ঘটল তারই এক পুত্রের হাতে।

১৭১৯ সালে নাদিরশা ভারত আক্রমণ করে নিয়ে গেলেন বহু রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেলেন রাজ-প্রাসাদকে রিক্ত করে সমুদয় রত্নভাণ্ডার আর প্রচুর অর্থসম্পদ। এর ঠিক চল্লিশ বছর পরে মারাঠা আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় এই রাজপ্রসাদ। এরপরে ১৭৯৩ সালে রোহিলা আক্রমণ এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের অভিযানে অনেক গৃহ ও রম্য উদ্যান ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। ইংরাজেরা অতঃপর এখানে স্থাপনা করেন সেনানিবাস। এর প্রায় একশ বছর পরে এই লাল কেল্লাতেই আজাদহিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের বিচার আরম্ভ হয়। পণ্ডিত নেহেরু ও ভুলাভাই দেশাই তাদের পক্ষ সমর্থন করেন। এর পরে অনুষ্ঠিত হয় মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীর বিচার। লালকেল্লা তাই ইতিহাসের স্মৃতি বহন করে চলে।

কেল্লার ভিতরে ঢুকবার জন্য আছে দুটি গেট; লাহোর গেট আর দিল্লী গেট। লাহোর গেটটী ৪১ ফিট উঁচু আর ২৪ ফিট চওড়া। এই লাহোর গেটেই সিপাহী যুদ্ধের সময় অনেক ইংরাজ সেনানী নিহত হয়। দিল্লী গেটের সাম্‌নে দুদিকে দুটি কাল পাথরের হাতী আছে।

গেট পার হয়েই নহবৎখানা। ঘরটা বেশ লম্বা। এক সময়ে নহবৎ বাজত মধুর সুরে, এখন সেখানে হয়েছে মিউজিয়ম। দেশী ও বিলাতী ছবি, ফটো, যুদ্ধে ব্যবহৃত নানারকম অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি, হরেক রকমের ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির সমাবেশ দেখলুম। ইংরাজ ও মোগল সৈন্যদের যুদ্ধাস্ত্রগুলি আধুনিক যুগে অচল হলেও এর মাধ্যমে তদানীন্তন যুদ্ধের বৈচিত্র্যের পরিচিতি পাওয়া যায়।

নহবৎখানার পরেই দেওয়ান-ই-আম। সম্রাটের সাধারণ দরবার। লম্বা একটা হলের মত ঘর, মাঝে মাঝে লাল পাথরের স্তম্ভ। এর ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু জায়গাতে সম্রাটের বসবার আসন, নীচে উজিরের বসবার জায়গাটী মার্বেল পাথরের তৈরী। উজির সামনে বসতেন, আমীর ওমরাহ, রাজা নবাব বসতেন তার পাশে, এরপর থাক্‌তেন উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দ। দরবার গম্‌গম্ করত।

রংমহলটী দেখবার জিনিষ। দেওয়ান-ই-আম ছেড়ে অন্তঃপুরে ঢুকলেই এটা চোখে পড়ে। সাদা মার্বেলের তৈরী। এক সময়ে এটা সোনার আর রূপার কাজে ঝক্‌ঝক্ করত। ঘরের মধ্যে মার্বেল পাথরের একটা কৃত্রিম ঝিল, এর মাঝে একটা ফোয়ারা। গঠন চাতুর্য সুন্দর। বায়ু চলাচলের জন্য জাফরী কেটে জানালার কাজ মেটানোর ব্যবস্থা। এরই ফাঁক দিয়ে বেগমেরা বাইরের খেলাধূলা দেখতে পেতেন। এখন সবই অচল, শুধুমাত্র প্রাচীন কীর্তির স্মারকচিহ্ন।

দেওয়ানী খাস সম্রাটের খাস দরবার। মার্বেল পাথরের তৈরী। দেওয়ান-ই-আমের চেয়ে এটা দেখতে আরও ভাল। বহু রত্নখচিত ছিল এই দরবার। মারাঠা ও জাঠ আক্রমণে সেগুলো লুণ্ঠিত হয়। দেওয়ান-ই-খাসের ছাতে লেখা রয়েছে, "স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে সেটা এখানেই, এখানেই।" খাঁটী স্বর্গ দেখার সুযোগ আমার হয় নাই, হবে কিনা জানিনে, তবে সম্রাটের তথাকথিত স্বর্গের রূপায়নে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। ময়ূর সিংহাসনটী এই ঘরেই থাকত, এই সিংহাসন নির্মাণে সময় লেগেছিল সাত বছর, এবং ব্যয় হয়েছিল প্রায় এক কোটি টাকা। সিংহাসনের দুধারে ছিল নানা রত্নখচিত সোনার ময়ূর। সোনার স্তম্ভগুলোও ছিল মণিমুক্তা মণ্ডিত। মুল্যবান রত্নে রচিত হয়েছিল একটি গাছ ও তৎসহ টিয়াপাখী। সিংহাসনের আয়তনই ছিল ২৪ বর্গফুট। অপূর্ব সুষমামণ্ডিত এই ময়ূর সিংহাসনটি নাদিরশা পারস্যে নিয়ে নষ্ট করে ফেলেন। এছাড়া আরও বহু মূল্যবান রত্নে শোভিত ছিল এই দেওয়ান-ই-খাস। সম্রাট এখানে বিশ্বস্ত পাত্র মিত্র নিয়ে গোপন আলোচনা করতেন। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

খাসমহল সম্রাটের বাসস্থান। দেওয়ান-ই-খাসের পাশেই এটা। পাশাপাশি তিনটি কক্ষ। তসবীর খানায় বসে বাদশাহ তসবীর জপতেন, খোয়াবাসে তার শোবার ঘর, এবং বৈঠকে চলত বৈঠকী আলোচনা। শয়ন ঘরটা আবার তিনভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটিই ছিল রত্নখচিত। বেতালিক ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প বলে সম্রাটের নিদ্রা আনয়নে সহায়তা করত। বৈঠক ও তসবিখানার দেয়ালে নানা রত্নশোভিত কারুকার্য্য, এক সময়ে ছিল। খোয়া বাসের পাশে একটা

মার্বেল পাথরের ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসাবে একটা দাঁড়িপাল্লার চিত্র।

দেওয়ান-ই-খাসের উত্তর দিকে হামাম বা স্নানের ঘর। এর দুধারে দুটি ঘরে সম্রাটের সন্তান সন্ততিরা থাকত। এছাড়া আছে আরও তিনটি ঘর, এর একটাতে আছে গোলাপ জলের আধার, আর একটাতে গরম ও ঠাণ্ডা জল আর একটাতে শুধু গরম জলের ব্যবস্থা। জল গরম করবার ব্যবস্থায় দরকার হত একশ মণ কাঠের। এই ব্যয়-বহুল ব্যবস্থা সম্রাট শাহজাহানের পরবর্তী কালে পরিত্যক্ত হয়।

এর পাশেই মতি মসজিদ। নির্মাতা সম্রাট আওরঙ্গজেব। মার্বেল পাথরের এই মসজিদে তিনি প্রত্যহ নমাজ পড়তেন, বেগমদেরও নমাজ পড়বার ব্যবস্থা ছিল এখানে। চারিদিক লাল পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

সমনবুর্জটি দেখবার জিনিষ। খোয়াবাগের অর্থাৎ সম্রাটের শয়ন ঘরের পূর্বদিকে এটা। মার্বেল পাথরের তৈরী। মোগল বাদশাহদের সূর্যোদয় দেখবার স্থান। ঐ সময় প্রজরাও সমবেত হয়ে তাকে অভিনন্দন জানাত। বুর্জটি যমুনা নদীর ধারে।

রেড ফোর্টে অনেকগুলো ফোয়ারা আছে। এসব ফোয়ারাতে জল আসত ছয় মাইল দূর থেকে। তখনকার দিনে পাম্প করে জল তোলবার ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই যমুনানদীর ছয় মাইল দূরে একটা উচ্চস্থান থেকে পাইপ দিয়ে জল আসত ফোয়ারায়।

হামামের বিপরীত দিকে হীরামহল। এখান থেকে সম্রাটেরা দেখতেন যমুনা নদীর দৃশ্য। এর পাশে আছে শাহবুর্জ্জ। মার্বেল পাথরের একটি জলাধার আছে সেখানে।

রংমহলের দক্ষিণে মমতাজমহল। এখানে এখন স্থাপনা

করা হয়েছে আর একটি মিউজিয়ম। প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থ, পোষাক পরিচ্ছদ, তরবারী, চিত্র ইত্যাদি এখানে সংরক্ষিত আছে। আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীন হস্তলিখিত কোরান শরীফ, ও নানারকম চিত্র এই মিউজিয়মের বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি জানায়। ভারতের শেষ মোগল সম্রাট ও তদীয় পত্নীর পরিধেয় পোষাকও এই মিউজিয়ামে সযত্নরক্ষিত আছে। প্রাচীন মুদ্রাগুলিও দেখবার জিনিষ।

লালকেল্লা ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলে অনেক সময় লাগে। কিন্তু এখন আর কোন প্রাচীন জৌলুষ নেই তার। তবে এর ঐশ্বর্যের প্রাচীন পরিচিতি ও পরবর্তীকালের করুণ ইতিহাস মানুষের মনকে বিচলিত করে তোলে।

বেগমপুরী মসজিদ দেখলুম। কুতুবমিনার যাবার পথে এটা। পাঠানযুগের বহু পুরানো মসজিদ এটি। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ তোগলক এই মসজিদটি নিমাণ করান। মসজিদটি আয়তনে বিশাল, সাধারন পাথরের টুকরো দিয়েই গড়া। সামনে একটা বড় গেট ভিতরে সারি সারি দালান। একপাশে দোতলা একটা ঘর। সম্ভবতঃ এখানে বেগমরা নমাজ পড়তেন। এবং সেই থেকেই বেগমপুরী নামকরণ হয়েছে। মসজিদটি অতি পুরাতন হলেও এখনও অটুট রয়েছে, তবে নমাজ পড়বার কাজে আর ব্যবহার হয় না। পাঠান স্থাপত্যের নিদর্শন এই মসজিদ।

এই মসজিদে যাবার পথেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। এই শাখা আশ্রমে স্কুল, পাঠাগার ও ধর্মানুশীলনের ব্যবস্থা আছে। পরিবেশটি ভাল।

কনট প্লেস দিল্লীর চৌরঙ্গী। আধুনিক শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক এটা। এর গোলাকৃতি গঠন অভিনবত্বের পরিচায়ক। শিল্প

বিপণিগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত ও মনোরম আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে গড়া।

দিল্লীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু বাজার। অনেক শাক-সব্জীর বাজার আবার রাস্তার ধারেই বসে। বাড়ীতে বসেই আবার অনেক জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। তবে বড় বাজার হিসাবে চাঁদনীর নাম উল্লেখযোগ্য। লালকেল্লার পাশেই এটা স্থাপিত। দরিয়াগঞ্জেও অনেক দোকানপাট আছে।

হুমায়ুন টুম্ব দেখলুম। এখানে ভারত সম্রাট হুমায়ুনের কবর আছে। দিল্লী শহরের মাঝামাঝি একটা উঁচু জায়গায় স্থাপিত। এর পাশ দিয়ে গেছে রেলপথ, অদূরে যমুনা নদী।

কবরখানাটি খুব উঁচু। প্রকৃতপক্ষে এটা চারতলা। চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা; ভিতরে প্রকাণ্ড একটা সাদা গম্বুজওয়ালা ইমারত। এই ইমারতের চারিপাশে ছোট ছোট অনেক ঘর। ইমারতের অভ্যন্তরে নীচের তালায় আসল কবর। দোতালার মাঝখানে একটা ঘর, এবং সেখানেও অনুরূপ একটা নকল কবর। এর আশে পাশের ঘরেও অনুরূপ অনেক নকল কবর আছে। উপরের গম্বুজটি মার্বেল পাথরের এবং তার উপর পিতলে মোড়ানো শীর্ষদেশ। কবরগুলোও মার্বেল পাথরের তৈরি। গম্বুজের অভ্যন্তর-ভাগে পাথর কেটে সুদৃশ্য করা হয়েছে। মীনার কাজও ঘরটির সৌষ্ঠব বর্ধন করছে। দরজা জানালাগুলো লাল পাথরের। তেতলার ছাদ থেকে সারা দিল্লী শহরের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখায়।

গম্বুজের নীচের দিকটার বাইরেও নানা রকম ফুল লতাপাতার মীনার কাজে সুদৃশ্য করা হয়েছে। তেতালার ছাদের উপর কয়েকটা মার্বেল পাথরের ছোট ছোট স্তম্ভ এবং এর শীর্ষদেশে গোলাকৃতি

মার্বেল পাথরের বল দিয়ে সৌষ্ঠব বর্ধন করা হয়েছে। তেতালা থেকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাওয়া যায় কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। এখান থেকে শহরের দৃশ্য আরও সুন্দর দেখায়।

বহুকালের তৈরি এই হুমায়ুন টুম্ব; কিন্তু এখনও এটা সৌন্দর্যে অটুট রয়েছে। দিল্লীর সুদৃশ্য পুরাকীর্তির মধ্যে এটা অন্যতম। শিল্প সৌন্দর্যে তাজমহলের পরেই এর স্থান।

ষোড়শ শতাব্দীতে হুমায়ুনের পত্নী হামিদাবানু বেগম এই কবরখানা নির্মাণ করেন। প্রাচীন মোগল স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন এই টুম্ব।

হুমায়ুন টুম্বের আশে পাশে কবরের অন্ত নেই। প্রাচীরের বাইরেও একটা প্রকাণ্ড কবরখানা। দর্শনীয় হিসাবে উল্লেখযোগ্য একটি অর্ধ-ভগ্ন কবরখানা। এর গোলাকৃতি গম্বুজ ও সবুজ মীনা করা ইঁটের কাজ দেখবার জিনিস। পাথরের উপরেও নানা সূক্ষ্ম কাজ। তবে কালের কবলে অনেক সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে গেছে।

হুমায়ুন টুম্ব থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে গেলেই খান খানাম কবরখানা। এটি আকবরের প্রধান উজীর বৈরাম খানের পুত্র আব্দুর রহিম খান-ই-খানামের কবর। জাহাঙ্গীরের শিক্ষাগুরু ছিলেন তিনি। আকবরের মৃত্যুর পরও দীর্ঘ আঠাশ বছর জাহাঙ্গীরের অধীনে কাজ করেছিলেন। কবরখানাটার কায়িক অবস্থা ভাল নয়। গঠনে হুমায়ুন টুম্বের অনেকটা অনুরূপ হলেও আকারে অনেক ছোট এবং শ্রীহীন। সাধারণ পাথরের তৈরি দোতালা ঘর। নানা কারুকার্যের ভগ্নাবশেষ মণ্ডিত। লাল পাথরের দরজাগুলোর অবস্থা ভালোই আছে। নীচে আসল কবর, দোতালাগুলোতেও অনুরূপ কবর আছে। বাইরের আস্তর অনেক জায়গায় উঠে গেছে। ঘর-

গুলোও ভেঙ্গেচুরে গেছে। গৃহটি কোন মতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

খান খানানের অনতিদূরে চৌষট্টি স্তম্ভ দেখলুম। এটিও একটি মার্বেল পাথরের তৈরি কবরখানা। ছত্রিশটি মর্বেল পাথরের স্তম্ভের উপর এই কবরখানা। মার্বেল পাথরের দেয়ালে নানা কারুকার্য। ঘরটি আনুমানিক ৭২ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট চওড়া। এটা ছোট হলেও সুদৃশ্য, এবং মার্বেল পাথরের উপর সুদৃশ্য কারুকার্যের জন্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন সম্রাটের ধর্ম ভ্রাতা মির্জা আজিজের কবর।

এর কাছেই আতালখানের কবর। ১৫৬৬ সালে এটি নির্মিত হয়। লাল পাথর আর মার্বেল পাথরের তৈরি এই কবরখানা।

পীর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার কবর দেখলুম। মুসলমানদের এটি একটি পরম তীর্থ বিশেষ। ছোট মার্বেল পাথরের ঘর, তবে দেখতে খুবই সুন্দর। ভক্ত মুসলমানগণ এই কবরখানাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। কবর ঢাকা রয়েছে সবুজ রংয়ের কাপড়ে, এবং তার উপরে অজস্র ফুল। কবরখানার আশে পাশে অসংখ্য ভিখারী হস্ত প্রসারণ করে ভক্ত যাত্রীদের করুণার উদ্রেকের প্রচেষ্টায় রত।

এর পাশেই একটা সুন্দর মসজিদ। পুরাতন হলেও সযত্ন রক্ষিত এবং নমাজ পড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। শাহজাহান কন্যা কবি জাহানারার কবরও আছে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির পার্শ্বে। জাহানারার শেষ ইচ্ছানুযায়ী যে কবরকে ঐহিক ঐশ্বর্যের প্রতীক করে তোলা হয়নি।

পীর নিজামউদ্দীন আউলিয়া ছিলেন জনহিতব্রতী নির্ভীক ফকির; তাঁর ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্যদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

দিল্লীর বাদশাহী তক্তে ছিলেন তখন দাস বংশীয় সম্রাট গিয়াসুদ্দীন। নিষ্ঠুরতায় তার দোসর কেউ ছিল না। তার সঙ্গে বাধল এই সাধু-পীরের বিবাদ।

ঘটনা সামান্য, সম্রাট গিয়াসুদ্দীন নির্মাণ করেছিলেন সুদৃঢ় দুর্গ, আর পীর চাচ্ছিলেন পিপাসু নর-নারীকে জল দানের জন্য পুষ্করিণী খনন। দুটোরই জন্য মজুর দরকার। দরিদ্র মজুরেরা অর্থের লোভ উপেক্ষা করে পীর সাহেবের পুকুর খননে যোগ দিল। বাদশাহ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সহসা কিছু করতে সক্ষম হলেন না। বিদ্রোহ দমনে তাঁকে সুদূরে যেতে হল।

বিজয়ী হয়ে তিনি দিল্লীর পথে ফিরলেন। পীর সাহেবের ভক্ত ও শিষ্যগণ প্রমাদ গণলেন। নিষ্ঠুর সম্রাট এবার পীর সাহেবকে কঠিন শাস্তি দিতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তারা সবাই ব্যাকুল হয়ে পীর সাহেবকে পলায়নের পরামর্শ দিলেন। পীর সাহেব মৃদু হাস্যে জানালেন, দিল্লী হনুজ দূর অস্ত—দিল্লী অনেক দূরে।

সম্রাট গিয়াসুদ্দীন সসৈন্য দিল্লীতে এসে পড়লেন। ভক্ত ও শিষ্যগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় সময় কাটাতে লাগল। পীর সাহেব নির্বিকার। মুখে মৃদু হাসি, কণ্ঠে বরাভয় বাণী।

অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন হল দিল্লী শহরে। সম্রাট জয়গর্বে স্ফীত হয়ে সভার মাঝে আসন পরিগ্রহ করলেন। আনন্দ উৎসব পুরোদমে চলতে লাগল। সহসা একটা প্রকাণ্ড হস্তী শুঁড় দিয়ে মঞ্চের স্তম্ভ আকর্ষণ করল। মঞ্চ ভেঙ্গে গেল সশব্দে। সম্রাট গিয়াসুদ্দীন অপঘাতে মারা গেলেন।

পীর নিজামুদ্দীন ভক্ত ও শিষ্যদের অভয়বাণী জানালেন, দিল্লী দূর অস্ত। আজও দিল্লীর দরগায় ভক্তের মনে পীরের আশ্বাস বাণী ধ্বনিত হয়, শত শত ভক্ত ও শিষ্য এসে সে আশ্বাস বাণীর প্রত্যাশায় দরগায় এসে মাথা নত করে।

দিল্লীর পল্লী অঞ্চল

দিল্লীর পল্লী অঞ্চলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগলুম। এর কোনটা দিল্লী শহরের অন্তর্ভুক্ত পল্লীপ্রান্তর, যাকে বলা হয় সুবারবন, শহরের অংশীভূত হলেও তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আলো এ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে নি। কোনটা আবার শহরের বাইরে পল্লী, শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি রূপ, না ঘরকা না ঘাটকা।

গ্রামাঞ্চলে বহু বাস্তুত্যাগী এসে আশ্রয় নিয়েছেন। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদের কেউ কেউ চলে গেছেন পাকিস্তানে। কেউ বা বাস্তুত্যাগীদের সঙ্গেই বাস করছেন। অসম্প্রীতির মনোভাবটা এখন আর নেই, সবাই উদরান্নের সংস্থানে ব্যস্ত।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা ভারতের সব স্থানেই একরূপ। অনুকরণ প্রবৃত্তি আর অভাবের আতিশয্য দুটোই যুগপৎ চোখের সামনে ধরা পড়ে। শহরের প্রান্তে স্থাপিত গ্রামগুলি হয়েছে শহরমুখী, জীবন যাত্রার প্রতি পদে শহরের অনুকরণ ছন্দায়িত হয়ে উঠে।

গ্রামের ঘরগুলি বেশির ভাগই পাকা, চালা ঘর কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। ইট বা পাথরে তৈরি। পাথর পাওয়া যায় প্রচুর, কাজেই খুব গরীব লোকও পাকা ঘরে বাস করবার সুযোগ পায়।

জলাভাব পরিচ্ছন্নতার প্রতিকূল হয়ে দেখা দেয়। দরিদ্র অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ অপরিচ্ছন্ন। জলের অভাবের দৈন্য এদের স্নানের ইচ্ছাটাকেও দমন করিয়ে রাখে, ফলে মাথায় দেখা দেয় উকুন এবং গা জুড়ে ফুটে ওঠে দাদের উৎপাত। পাকা কুয়োতে জল থাকে অনেক নীচে, কপিকলের সাহায্যে অনেক কষ্টে তুলতে হয় জল। অনেক বাড়ীতেই কূপের ব্যবস্থা নেই, অনেক ব্যয়সাধ্য এটা। তাই জল নেবার জন্য কূয়োর কাছে ভিড় জমে যায়। কোথাও বা গরু ও উটের সাহায্যে জল তোলার ব্যবস্থা থাকে। ক্ষেতে জল দেবার ব্যবস্থাপনায় এভাবে জল নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

শীতের দিনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি, মেয়েরা অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে রৌদ্র সেবন করছে, আর পরস্পরের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে। বাস্তুত্যাগী মেয়েরা এসেছেন পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে। এঁদের পরণে সালোয়ার ও পায়জামা আর ওড়না, কিন্তু সেগুলো প্রায়ই ময়লা। পরিচ্ছন্নতা অনেকটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, কিন্তু জলাভাব যেখানে প্রকট, সেখানে এ অভ্যাসের পরিস্ফুরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

চিত্রটি দরিদ্র পল্লীর, সারা ভারত জুড়েই এই সব দরিদ্র পল্লীর অবস্থান. তবে এটা রাজধানীর পাশে আর এদের সমস্যারও অন্ত নেই।

[illegible] অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, বর্তমান সহরমুখী সভ্যতার অবদান। ক্ষেতের কাজ, দিল্লী সহরের দোকানের কর্মচারীর কাজ কিম্বা সরকারী অফিসের পিওনী পদই এদের পরম চরিতার্থের প্রকাশ; দিন গুজরান করবার অবলম্বন। লেখাপড়ার বালাই ছিল না, সম্প্রতি পিওনী পদের লোভে লেখাপড়া শেখবার দিকে একটা ঝোঁক এসে পড়েছে।

গ্রামের কায়িক অবস্থার বাহ্যিক একটা চাকচিক্যের পরিচয় থাকলেও নোংরা। সরকারী রাস্তাটায় সুস্থভাবে চলবার উপায় নেই। ময়লা ডিঙ্গিয়ে চলতে হয় পথ। তাছাড়া রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলেছে ময়লা জলের উন্মুক্ত নিস্কাশন, তাতে রয়েছে অসংখ্য মশার আস্তানা, ডিঙ্গিয়ে যেতে হলেই যেন মৌচাকে ঢিল পড়ে।

গ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে চৌপাল। বাংলাদেশের চণ্ডীমণ্ডপের মত। এখানে এসে গ্রামের লোকেরা নিত্য বৈঠক বসান, গ্রামীন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং উৎসবাদি পরিচালনার ব্যবস্থাও করেন। গ্রামের চৌপাল গ্রামের প্রাণ কেন্দ্র ও আনন্দের উৎস। এদের তামাক সেবনও উপভোগের জিনিষ। গড়গড়ার উপর ছোট খাট হাঁড়ির মত একটা প্রকাণ্ড কল্কি, তাতে অফুরন্ত তামাক। গড়গড়া অনবরত হস্ত পরিবর্তন করছে কিন্তু তাতে এর নিঃশেষ নেই। একবার আগুন ধরিয়ে নিলে ঘন্টার উপর ঘণ্টা কাটানো চলে। দড়ির খাটিয়া এদের বিশ্রামের স্থান, রাতে শয়ন আর দিনে উপবেশন দুটোর কাজই তাতে চলে।

বেগমপুর গ্রামটায় কদিন গেলুম। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও হল। এই গ্রামেই বিখ্যাত বেগমপুরী মসজিদ অবস্থিত। তার আশে পাশে ফিরোজশাহ তোগলকের আমলের অসংখ্য ভগ্ন প্রাচীন কীর্তি। দিল্লীর প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কিছু কিছু পুরাকীর্তির ভগ্নাবশেষ রয়েছে। পাথরের স্তূপ ইতস্ততঃ ছড়ানো, গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলে নানারকম কিংবদন্তীর পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীগুলির অনেকটাই ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখে না। হয় ইতিহাস এদের পরিচয় নেয়নি, নয়ত অনুমান আর অলঙ্কারের চাপে ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে।

গ্রামের উন্নতির প্রচেষ্টার কথা জানালে গ্রামবাসীরা জানালেন, করপোরেশনে ট্যাক্স দিচ্ছি তার কর্তৃপক্ষরাই এ্যাবস্থা করবেন। এসব আমরা পেরে উঠব না।

একটা হতাশা আর পর নির্ভরতার মনোভাব আমাদের সমস্ত সদিচ্ছাগুলোকে নষ্ট করে দিতে বসেছে। নিজেদের ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতার জন্যও অন্যকে দোষারোপ ও নিজের অক্ষমতা জানাতে আমরা কুণ্ঠিত হই না। দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে পরনির্ভরসেবী যে মনোভাব গড়ে উঠেছে সেটার একটা আমূল পরিবর্তন না ঘটলে জাতির মানদণ্ড নীচের কোঠায় পড়ে থাকে। সুখের বিষয় সে বিষয় একটা চেতনা সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এর বিকাশ সাধনের উপরেই ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

করপোরেশন ট্যাক্স নেয় সত্যি, এবং মোটা হারেই নেয়। সহরের প্রত্যন্ত প্রদেশে তাদের দৃষ্টি সুন্দরভাবে পতন হয় না, পতনের চেষ্টাও বারবার ব্যাহত হয়। কিন্তু জীবন যাত্রার অত্যন্ত আবশ্যিক ক্ষেত্র, যেটা দৈনন্দিন পরস্পারের সাহচর্যের উপর চলে, ব্যক্তিগত আচার বিচার, স্বাচ্ছন্দ্য, রুচিবোধ, এসবও যদি অন্যের উপর তুলে ধরি, জানাই, এটা করবে সরকার অথবা করপোরেশন বা ঐ রকম একটা কিছু প্রতিষ্ঠান—তাহলে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক জীবনের সার্থকতা কোথায়? পৃথিবীতে মানুষ আসে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ নিয়ে, বাস করবার অধিকার তাই অর্জন করতে হয় এই দায়িত্ববোধের সম্যক পরিস্ফুরনে এর অভাব হলে জীবনটা হয়ে উঠে অচল, ব্যর্থতার আবর্জনায় ভরা।

ভারতের প্রাচীন গ্রাম ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। সমাজ ব্যবস্থায় ছিল ছোটখাট রাজ্যের প্রতিফলন। বিদেশী শাসন, যান্ত্রিক সভ্যতা

পরনির্ভরতা, দারিদ্র্য আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে ভাঙ্গনের প্রতিক্রিয়া চলছে, তাই গ্রামবাসী আর প্রতিবেশীকে চিনতে চায় না, পরিবার বন্ধন শিথিল এবং জীবন সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া সুকুমার বৃত্তিগুলোও নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের বৃদ্ধ মোড়লের দৃষ্টি তাই নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বর্তমানের ছাঁচে সেই প্রাচীন রূপ ফিরিয়ে আনবার একটা প্রচেষ্টা চল্‌ছে, সাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, সমবায় প্রতিষ্ঠা, ও গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোর উন্নতি সাধন এরই অভিব্যক্তি মাত্র।

বেগমপুর গ্রামে একটা সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় দেখলুম। স্কুলের মেয়েরা বাদ্যযন্ত্র সহকারে নৃত্যের ছন্দে শরীর চর্চা দেখাল। বেশ ভাল লাগল। মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র, যাকে বলা হয় লেজম্! চিমটের মত দুধারে দুটি পাতের সঙ্গে কয়েক জোড়া করতালের পাত বসানো। হাত দিয়ে চাপলে ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে। তালে তালে নৃত্যের সঙ্গে এই লেজমবাদ্য অতি সুন্দর হয়। সমষ্টি নৃত্যের এটা সুন্দর পরিপোষক।

সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, রেডিও শ্রবন, ও মেয়েদের হস্তশিল্প, খাদ্য প্রণয়ন ইত্যাদি শেখানো হয়। মেয়েদের তৈরী অনেক জেম জেলিও দেখলুম। সহরে এগুলো বিক্রী করে মেয়েরা দুপয়সা উপার্জনও করেন।

শ্রীমতী রায় ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনি গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করলেন। মেয়েদের চিত্ত বিনোদনের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রে সঙ্গীতের জন্য বাদ্য যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের মেয়েরা ধরে বসলেন তাকে একটা গান করতে। একটা হারমোনিয়মও তাঁর সামনে রাখা হল।

চলছে। একটা গভীর কূপে যন্ত্রপাতি বসানো রয়েছে এবং বলদের সাহায্যে যেখান থেকে সেচনের জন্য জল তোলা হচ্ছে। জল সঞ্চিত হচ্ছে নাতি বৃহৎ একটা কৃত্রিম জলাশয়ে এবং সেখান থেকে ক্ষেতে সেচনের ব্যবস্থা হচ্ছে। ক্ষেতগুলোর অবস্থাও ভাল। নিয়মিত জল সেচনে গাছগুলো সুস্পষ্ট হয়ে শোভা পাচ্ছে। এ ছাড়া ঐ কূয়োর যন্ত্রপাতির সঙ্গে বসানো হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, গ্রামকে বিদ্যুৎ-সরবরাহ করবার পরিকল্পনায়, এখনও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হয়নি। আপাততঃ এই ব্যবস্থায় যে বিদ্যুৎ-উৎপাদিত হচ্ছে, তা দিয়ে একটা কারখানায় কাজ চলছে। এর পরে এরা গ্রামে আলো ও বিদ্যুৎ পরিচালিত কুটির শিল্পের ব্যবস্থা করবেন। পরিকল্পনাটি ভাল এবং বেশ আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। এটা পরীক্ষামূল ভাবে চল্‌ছে। সাফল্য লাভ করলে এই ব্যবস্থা ভারতের নানা গ্রামে সম্প্রসারিত করা হবে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য ছাড়া এখনও সরকারী ও বেসরকারী কোন অর্থ সাহায্য এঁরা পাননি। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনায় এইরূপ প্রচেষ্টা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে, সন্দেহ নেই।

এদের কারখানাটিও দেখলুম। লোহার ও কাঠের কাজ বিদ্যুতের সাহায্যে করা হচ্ছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিমিষে নানান আকারের কাঠ কাটিয়ে ও পালিশ করে আসবাব পত্রাদি তৈরী করবার ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও কারখানার অঙ্গের সামিল।

দেউলী গ্রামে গেলুম একদিন। এখানে সরকারী সাহায্যে ও স্থানীয় অধিবাসীদের অর্থানুকূল্যে একটা সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের ভবন নির্মিত হচ্ছে। সারা ভারত জুড়েই চলেছে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন, গড়ে উঠেছে বিদ্যায়তন, হাঁসপাতাল আরও

কত কি? সরকার ও দেশবাসী এখন যে আর পৃথক সত্তা নয়, একটাই অপরটার অভিব্যক্তির প্রকাশ ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, গণতন্ত্রের এই চেতনামূলক অভিধা এখনও দেশবাসীর মনে সম্যকভাবে জাগরিত না হলেও যে সুষ্ঠু বোধের চেতনা উঁকি ঝুকি দিয়ে উঠ্‌ছে, তাতেই এই গঠনমূলক কার্যে পরস্পরের হাত মেলানোর সুস্পষ্ট পরিচিতি দানা বাঁধছে।

এই গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হল। অন্যান্য গ্রামের মতই নানা সমস্যা-জড়িত গ্রাম। মিলনের বেদীটিও ঈর্ষাভারে প্রপীড়িত। আর্থিক সমস্যা মনের বিকাশের প্রতিকূল হয়েই নিত্য দেখা দেয়। স্থানীয় সমাজসেবী রামকিষণজী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস দুধ খেতে দিলেন। ইনি ইতিপূর্বে মিলিটারীতে কাজ করতেন জনৈক জঙ্গী সাহেবের পরিচারক হয়ে ইয়োরোপের নানা দেশ দেখে এসেছেন। লেখাপড়া জানেন সামান্য, তবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অনেক ইয়োরোপীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন। নিজের বৈচিত্র্যমূলক অভিজ্ঞতার কথাও সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারেন।

গ্রামে অল্প কয়েক ঘর লোক বাস করেন। রাস্তাগুলি অপরিসর। বেশির ভাগ লোকই ক্ষেতের কাজ করেন। গরু-মহিষই এদের প্রধান ভরসা। দিল্লী অঞ্চলের গরু-মহিষগুলোর চেহারা ভাল। বাংলা দেশের মত কঙ্কালসার দুর্বল গরু এরা নয়। ক্ষেত থেকে সরিষার গাছ তুলে নিয়ে এসে কুটো করে গরু মহিষদের খেতে দিতে দেখলুম। ঘাসের অভাব খুবই, তাই এ ব্যবস্থা।

গ্রামটিকে ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ের মত মৃত্তিকার স্তূপ। এর মধ্যে রয়েছে তোগলকাবাদের ছোট বড় অনেক ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ। সারা দিল্লীর চিত্রই এই। কোনটা যে

কি ছিল বোঝবার উপায়ই নে। গ্রামবাসীরাও বলতে পারেন না, কখন কখন অনুমান করে কিছু বলেন মাত্র। দেখেই বোঝা যায় গ্রামটা ছিল এককালে সমৃদ্ধ। পাঠান যুগে হয়ত কত আমীর ওমরাহের বাসস্থান ছিল এখানে। গ্রামের কঠিন মাটিও কেঁপে উঠত পাঠান সৈন্যের দম্ভ আস্ফালনে। ইতিহাসের বিচিত্র গতির পরিবর্ত্তনে লুপ্ত হয়ে গেছে সে সমৃদ্ধির সমাবেশ। রাজনৈতিক দাবা খেলায় যে রাজা হয়েছেন, কিস্তিমাৎ সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য, দম্ভ অহঙ্কারের সমাধি রচিত হয়েছে ভগ্নস্তূপের আড়ালে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো প্রাসাদের শেষ চিহ্ন, খণ্ড খণ্ড পাথরের স্তূপ ও মৃত্তিকার প্রাচীর-বেষ্টনী নরকঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে তারই পরিচিতি জানিয়ে দিচ্ছে।

মেহরৌলিতেও একদিন গেলুম। এটি দিল্লী সহরের একটা প্রত্যন্ত অংশ ও অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চল। কুতুব-মিনার ও তার ভগ্নাবশেষ এই গ্রামেরই একপাশ ঘিরে রয়েছে। এখানে সমবায় সমিতির একটা কেন্দ্রীয় সংঘ আছে। এই বেসরকারী সংস্থা সমবায় সমিতির উন্নয়নমূলক কাজ ও সামাজিক শিক্ষা উন্নয়নের ভার নিয়েছে। এঁদের একজন মহিলা কর্মী আমাদের পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে নিয়ে গেলেন।

গ্রামটার নাম সুলতানপুর। জ্বালানী কাঠের সমস্যার সমাধানে সমবায় সমিতির অর্থানুকূল্যে একটা গোবরের গ্যাস প্ল্যাণ্ট এঁরা এই গ্রামে স্থাপনা করেছেন। ব্যবস্থাটি সুন্দর ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। একটা কূয়োর মতো পাকা চৌবাচ্চা, তাতে রয়েছে গোবর আর জল। উপর থেকে লোহার একটা প্রকাণ্ড ঢাকনা কপিকলের সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্যাস এসে এই ঢাকনার ভেতর জমা হয়। নলের সাহায্যে এই গ্যাস নিয়ে যাওয়া হয়েছে রান্না

ঘরে। সাত আটটি গরু মহিষের গোবর দরকার হয় ছোট একটি পরিবারের রান্নার জন্য গ্যাস সৃষ্টি করতে। রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাস জ্বালানোর ব্যবস্থাদি দেখলুম। উনুনের সঙ্গে গ্যাসের নলটি লাগানো। ছোটখাট একটা পরিবারের রান্না এতে চলতে পারে। গোবর জলও পরে সারের কাজ করে।

আমাদের দেশে আমরা গোমাতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করি। গোবরও পবিত্রতার প্রতীক বলে মেনে নিই। কিন্তু সত্যিই কি তাই! দেশের গোমাতার কায়িক অবস্থা আর গোবরের অপব্যবহার দেখলে এর প্রতিকূল আচরণই প্রকাশ পায়। গরুকে আমরা খাটিয়ে নেব মাঠে ঘাটে সব জায়গায় নিষ্ঠুরভাবে, দুধ দুইয়ে নেব নিংড়ে নিয়ে, গোবর ব্যবহার করব বসুন্ধরার আহার্য বঞ্চনা করে শুকনো ঘুঁটের আকারে। দেশে খাদ্যাভাব, জ্বালানী কাঠেরও অভাব। এই দুটি অভাব নিরসনের জন্য ক্ষুদ্র এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা দেখে আনন্দ হল।

আমরা এঁর সঙ্গে আর একটা গ্রামে গেলুম, নাম তার চন্দনহোলা। এ গ্রামের সমস্যা জটিল। অনেকগুলো গ্রামোন্নয়নমূলক সংস্থা পরস্পরের প্রতি যোগাযোগ রক্ষা না করে প্রতিযোগিতামূলক কাজ বিপরীতভাবে করে চলেছেন। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার ফলে কাজ সুবিধা মত এগোচ্ছে না। গ্রামবাসী ও সরকারী অর্থ সাহায্যে গ্রামে একটা সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনা করা হয়েছে। গ্রামের মোড়ল তার অনেক অংশ জুড়ে স্বীয় আবাস করে ফেলেছেন। তাকে চটিয়ে গ্রামের উন্নয়ন কাজ করা চলে না, অথচ এত ব্যবস্থা স্বত্বেও গ্রামটা অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। দলাদলিরও অন্ত নেই।

জনৈক গ্রামবাসী আমাদের হিন্দী ভজন গেয়ে শোনালেন। সুরটা কর্কশ কিন্তু আন্তরিকতার চিহ্ন পরিস্ফুট।

ফেরবার পথে একজন বন্ধু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলেন, 'মীরা কহে, বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলাল।।'

গানটা অন্তরে এসে আঘাত হানল। তাই তো, বিনা প্রেমে জগতে তো কিছুই হবার উপায় নেই। কোথায় গেল সে প্রেম,—পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, যা শুধু গ্রামের নয়, বিশ্বের জনগণকেও একান্ত আপনার ক'রে নেয়। সাধিকা মীরা চেয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো রয়েছেন কোটি কোটি সৃষ্ট জীবের অন্তরে।

গ্রামের লোকদের পরিচয় তো সম্যক ভাবে নিতে পারি নি, শুধু বার বার তাদের ভুলটাই এসে চোখের সামনে ধরা পড়েছে। তাদের অন্তরের ঐশ্বর্য, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, সহজ-সরল-সুন্দর অনাড়ম্বর জীবন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও আনন্দের পরিস্ফুরণ জীবনের একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি যা প্রতিনিয়তই আমাদের অন্তরে পরিচিতি জানিয়েছে। সেটা যেন দেখেও দেখতে পারি নি।

জাতির জীবনে এসেছে মর্যাদা বোধের অভাব। যাদের জন্য আমাদের মর্যাদা, তাদের আমরা দূরে ফেলে দিই; যারা আমাদের অমর্যাদা আনয়ন করে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই। আমরা স্মিত বদনে দাঁড়াই অমর্যাদার শীর্ষস্তম্ভে, আত্মপ্রসাদে আত্মহারা হই, ভাবি, অন্যের অমর্যাদা করলেই আমাদের মর্যাদা বাড়বে।

শহর ও গ্রাম। শহর শোষণ করে গ্রামকে, গ্রাম নিজের শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে শহরকে বাঁচায়। গ্রাম হয়েছে নিঃস্ব, রিক্ত, রক্তহীন। এর

এই পাণ্ডুর বদনে রক্তের সঞ্চার না করলে শহরের সুচারু সৌধগুলো আর কতদিন টিকে থাকবে ? এর জন্য দরকার তাই প্রেম। প্রেমের হস্ত প্রসারণ দরকার—বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

লক্ষ্ণৌ

দিল্লী থেকে এসে পৌঁছলুম লক্ষ্ণৌ। এক রাতের পথ। গাড়ী ছাড়ে দিল্লী থেকে সন্ধ্যের পর, প্রত্যূষে এসে পৌঁছে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। ডিসেম্বর মাস। ভেবেছিলুম দিল্লীর মতই হাড় কাঁপানো শীত হবে এখানে। এসে দেখলুম, শীতের যে কল্পনাটা মনের মধ্যে দানা বেঁধেছিল, বাস্তবের পরিচিতিতে সেটা উবে গেল। শীত এখানে আছে বটে, কিন্তু দিল্লীর তুলনায় কিছুই নয়। লক্ষ্ণৌ শহরটা দিল্লী থেকে তিনশ' মাইল পূর্ব-দক্ষিণে, তাই হয়ত শীতের মাত্রাটা কম।

সদলে এসে উঠলুম স্বাক্ষরতা নিকেতনে (Literacy House)। স্বাক্ষরতা নিকেতন সামাজিক শিক্ষার গবেষণা ও শিক্ষণ কেন্দ্র। সর্ব ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে এটা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

সম্প্রতি এখানে শহরাঞ্চলে সামাজিক শিক্ষার কি রূপায়ণ হওয়া আবশ্যক, তারই সমাধানে খসড়া রচনার জন্য সুধীবৃন্দের সমাবেশ হয়েছে। সেমিনারে আলোচনা কয়েক দিন ধরেই চলবে। সভ্যগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবেন এবং পরে বিভিন্ন দলের সুচিন্তিত মতের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বৈঠক বসবে। এমনিভাবেই চলবে কয়েকদিন ধরে

নতুন করে নতুন সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে সুষ্ঠু আলোচনা ও পরবর্তী অধ্যায়ে তার বিভিন্ন সম্মিলিত মতের সামঞ্জস্য বিধান। ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে সভ্যগণ এসে এই আলোচনার অংশভাগী হয়েছেন, আমাদের দলটিও ঐ সভ্য শ্রেণীর একাংশ। সেমিনার পরিচালনার ভার নিয়েছেন ভারতীয় বয়োজন শিক্ষা সংঘ (Indian Adult Education Association]। ভারতের নানা স্থানে নানাভাবে আলোচনার জন্য এমনিভাবে কত সেমিনার চলছে, তার ইয়ত্তা নেই। কোনটা গ্রামাঞ্চলে গ্রামীন সমস্যার সমাধান করছে, কোনটা বা সর্ব-ভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে বিপুল সমস্যার সমাধানে সম্মুখীন হচ্ছে। উদ্দেশ্য একই, স্বাধীন ভারতের নব রূপায়ণে সুধীজনের অনবদ্য মননশীলতা ও ঐকান্তিক উদ্যম।

কয়েকদিন আলোচনা বৈঠক যথারীতি চলল। এরপর হঠাৎ এক দিন ছোটখাট একটা বিপর্যয় ঘটে গেল।

সভ্যদের পূর্ণ বৈঠক চলছে। আমাদের দলভুক্ত সভ্য ছিলেন মধ্য প্রদেশের কোচার। দীর্ঘকাল চুপ করে থাকার পর হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করে বসলেন, হিন্দীভাষা রাষ্ট্রভাষা, এর আগে যে আঞ্চলিক সম্মেলন হয়েছিল, তাতে প্রস্তাবনা নেওয়া হয়েছে হিন্দী ভাষার, সুতরাং এক্ষেত্রেও হিন্দী ভাষাতেই প্রস্তাব গ্রহণ করা সমীচীন।

বৈঠকে এ প্রস্তাবে তুমুল বিক্ষোভ প্রকাশ পেল। দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষী জনৈক সভ্য প্রস্তাবনা করলেন, তামিল ভাষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ, সুতরাং প্রস্তাবনা সমস্ত তামিল ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তেলেগুভাষী জনৈক সভ্য প্রস্তাব করলেন, তেলেগু ভাষা সাহিত্য সম্ভারে সমৃদ্ধ এবং ভারতীয় ভাষার মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। সুতরাং প্রস্তাবনা সমূহ তেলেগু ভাষাতেই গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা থেকেও জোর রায়মশায় প্রস্তাব করলেন, বাংলা ভাষা ভারতীয় ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। ভারতের বাইরেও এর সুনাম কম নয়, সুতরাং বাংলা ভাষাতেই প্রস্তাব নেওয়া সঙ্গত।

ভাষাগত এই বিরোধের সূত্রপাত দেখে সভাপতি মশায় বিচলিত হয়ে উঠ্‌লেন। অন্য ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে আরও দু'একজন প্রতিবাদ জানাতে উপক্রম করলেন। এঁদের সবাইকে নিরস্ত করে সভাপতি মশায় জানালেন, হিন্দীভাষা এখনও সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করেনি। রাষ্ট্রভাষা দেশে চালু হওয়া সময় সাপেক্ষ। এর আগে যে আঞ্চলিক সম্মিলন বসেছিল, সে শুধু ছিল হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে, তাই হিন্দী ভাষাতেই সে অধিবেশনে প্রস্তাব লিখিত হয়েছিল। বর্তমান অধিবেশন সর্বভারতীয়, সুতরাং এর আলোচনা ও প্রস্তাবনা ইংরাজী ভাষাতেই চল্‌বে। দেশের বর্তমান অবস্থায় ইংরাজী ভাষার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে।

ভাষা নিয়ে এই বিরোধটা ভাল লাগল না। হিন্দী ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছে এটাও যেমন সত্য তেমনি এ ভাষাকে চালু করতে হলে এর একটা আমূল সংস্কার সাধন দরকার এটাও অস্বীকার করা চলে না। শুধু জিদের বশে অনিচ্ছুক জনমণ্ডলীর উপর ভাষার বোঝা চাপালে প্রতিবাদের সুরই ফুটে উঠে। ভাষা সর্বজন গ্রাহ্য হয় তার অনবদ্য সাহিত্য সম্ভারে, সহজ বোধগম্যতায় ও অপূর্ব মননশীলতার প্রাখর্যে। ইংরাজী ভাষা সারা পৃথিবী জুড়ে ঐক্যের বাঁধন সৃষ্টি করেছে তার অবদানের ফলে। কাজেই ইংরাজী ভাষার শূন্যস্থান পূরণ করতে হলে অনুরূপ অবস্থার আয়োজনে মনোনিবেশ করা দরকার।

বড় একটা বাসে লক্ষ্ণৌ সহর দেখতে বের হলুম একদিন।

লক্ষ্ণৌকে বলা হয় "নবাবের সহর।" বড় বড় প্রাসাদ সহর জুড়ে রয়েছে। সবগুলিই মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন। দুচারটী দালান অবশ্য আধুনিক রূপ নিয়েছে।

হোসেনাবাদ ইমামবড়ায় এসে পৌঁছলুম। সুন্দর দেখতে এই ইমামবড়া। মার্বেলের মেঝে, সাদায় কালোয় ভরা। নানা রঙীন কাঁচ ঘরগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। মাঝের ঘরটায় নবাব আর তার বেগমের করব। পাশের একটা ঘরে মোমের তৈরী একটা মহরমের তাজিয়া রাখা হয়েছে। মহরমের উৎসবের দিনে বের করা হয়। এর সুক্ষ্ম কাজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দেয়ালে একটা ছবি টাঙ্গানো দেখলুম। প্রথম দর্শনে মনে হয় নানা বিন্দুর সমষ্টি। গাইড জানাল ছবিটায় কোরাণ শরীফ লেখা রয়েছে। আতসী কাঁচের সাহায্যে দেখলুম, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে আরবী ভাষায় কোরাণ শরীফ লেখা রয়েছে তাতে। সুদক্ষ শিল্পীর অপূর্ব লিখন। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বাস এসে থামল আবার রুমিগেটের সামনে। বড় ইমামবড়ার পশ্চিমদিকে এই বিরাট গেট। এর খিলানগুলি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। তিনটি বড় খিলান। দুধারে দুসারি দোতলা দালান। রুমিসেটটিও লক্ষ্ণৌএর দর্শনীয় আকর্ষণ।

নবাব আসফ উদ্দৌলার বড় ইমামবড়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে এটা। দুর্ভিক্ষের সময় আহার দেবার ব্যবস্থাপনার জন্য এটা নির্মিত হয়েছিল। বড় ঘরটায় নবাব আসফ উদ্দৌলা আর তার বেগমের কবর। হলটার বৈচিত্র্য আছে। এত বড় ছাদওয়ালা হল পৃথিবীতে দুর্লভ! এর চারিদিকে রয়েছে অসংখ্য সিঁড়িবহুল গলি পথ। দুই দেয়ালের মাঝ দিয়ে এই সরু পথ ছাদে চলে গিয়েছে।

হলের চারধারে দোতলার সমান উঁচু স্থান দিয়ে চলবার পথ। এই পথ দিয়ে চলবার সময় বিরাট হলঘরটার রূপ বেশ ভালভাবে দেখবার সুযোগ মেলে।

এই সিঁড়িবহুল গলিপথকে স্থানীয় লোকেরা বলেন, "ভুল ভুলাইয়া"। সত্যিই এটা পথ ভুলিয়ে দেয়। গাইড সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে এই অন্ধকার গলি পথে গোলক ধাঁধাঁর মত বারবার একই পথে ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা। সারা পথটা একবার ঘুরে আস্‌তে হলেই ক্লান্তি দেখা দেয়। অপরিসর অন্ধকার গলিপথে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আস্‌তে চায়। গলি পথটা ঘুরে নিয়ে হলের উঁচু পথটার সঙ্কীর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ যেন মাথাটা একটু ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। অতি কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে খোলা ছাদে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। ভুল ভুলাইয়ার এই গলিপথ পরিদর্শনের জন্য চার আনা দক্ষিণা দিতে হয়। তবে এই পরিদর্শনে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায় দক্ষিণা তার তুলনায় কিছুই নয়।

নবাব আসফ উদ্দৌলার মসজিদটিও দেখলুম। বড় ইমামবড়ার ডানদিকে এই মসজিদ। এখনও এখানে নিয়ম মত নমাজ পড়া হয়। লক্ষ্ণৌএর জুম্মা মসজিদও দেখবার জিনিষ। মহম্মদ আলীশাহ এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ দেখে যেতে পারেননি, পরে নবাব বংশের বেগম মূলকাজাহান এর নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে এলুম। সিপাহী যুদ্ধের সময় এটা ছিল ইংরাজের আস্তানা। রেসিডেন্সীর ইতিহাস সিপাহী যুদ্ধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এখন এটা ভগ্নাবস্থায় প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

লক্ষ্ণৌএর প্ল্যানিং ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সামাজিক শিক্ষা, সমবায়

লক্ষ্ণৌকে বলা হয় "নবাবের সহর।" বড় বড় প্রাসাদ সহর জুড়ে রয়েছে। সবগুলিই মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন। দুচারটী দালান অবশ্য আধুনিক রূপ নিয়েছে।

হোসেনাবাদ ইমামবড়ায় এসে পৌঁছলুম। সুন্দর দেখতে এই ইমামবড়া। মার্বেলের মেঝে, সাদায় কালোয় ভরা। নানা রঙীন কাঁচ ঘরগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। মাঝের ঘরটায় নবাব আর তার বেগমের করব। পাশের একটা ঘরে মোমের তৈরী একটা মহরমের তাজিয়া রাখা হয়েছে। মহরমের উৎসবের দিনে বের করা হয়। এর সুক্ষ্ম কাজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দেয়ালে একটা ছবি টাঙ্গানো দেখলুম। প্রথম দর্শনে মনে হয় নানা বিন্দুর সমষ্টি। গাইড জানাল ছবিটায় কোরাণ শরীফ লেখা রয়েছে। আতসী কাঁচের সাহায্যে দেখলুম, অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে আরবী ভাষায় কোরাণ শরীফ লেখা রয়েছে তাতে। সুদক্ষ শিল্পীর অপূর্ব লিখন। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

বাস এসে থামল আবার রুমিগেটের সামনে। বড় ইমামবড়ার পশ্চিমদিকে এই বিরাট গেট। এর খিলানগুলি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। তিনটি বড় খিলান। দুধারে দুসারি দোতলা দালান। রুমিসেটটিও লক্ষ্ণৌএর দর্শনীয় আকর্ষণ।

নবাব আসফ উদ্দৌলার বড় ইমামবড়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে এটা। দুর্ভিক্ষের সময় আহার দেবার ব্যবস্থাপনার জন্য এটা নির্মিত হয়েছিল। বড় ঘরটায় নবাব আসফ উদ্দৌলা আর তার বেগমের কবর। হলটার বৈচিত্র্য আছে। এত বড় ছাদওয়ালা হল পৃথিবীতে দুর্লভ! এর চারিদিকে রয়েছে অসংখ্য সিঁড়িবহুল গলি পথ। দুই দেয়ালের মাঝ দিয়ে এই সরু পথ ছাদে চলে গিয়েছে।

হলের চারধারে দোতলার সমান উঁচু স্থান দিয়ে চলবার পথ। এই পথ দিয়ে চলবার সময় বিরাট হলঘরটার রূপ বেশ ভালভাবে দেখবার সুযোগ মেলে।

এই সিঁড়িবহুল গলিপথকে স্থানীয় লোকেরা বলেন, "ভুল ভুলাইয়া"। সত্যিই এটা পথ ভুলিয়ে দেয়। গাইড সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে এই অন্ধকার গলি পথে গোলক ধাঁধাঁর মত বারবার একই পথে ঘুরে বেড়াবার সম্ভাবনা। সারা পথটা একবার ঘুরে আস্‌তে হলেই ক্লান্তি দেখা দেয়। অপরিসর অন্ধকার গলিপথে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আস্‌তে চায়। গলি পথটা ঘুরে নিয়ে হলের উঁচু পথটার সঙ্কীর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ যেন মাথাটা একটু ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। অতি কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে খোলা ছাদে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। ভুল ভুলাইয়ার এই গলিপথ পরিদর্শনের জন্য চার আনা দক্ষিণা দিতে হয়। তবে এই পরিদর্শনে যে আনন্দটুকু পাওয়া যায় দক্ষিণা তার তুলনায় কিছুই নয়।

নবাব আসফ উদ্দৌলার মসজিদটিও দেখলুম। বড় ইমামবড়ার ডানদিকে এই মসজিদ। এখনও এখানে নিয়ম মত নমাজ পড়া হয়। লক্ষ্ণৌএর জুম্মা মসজিদও দেখবার জিনিষ। মহম্মদ আলীশাহ এর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ দেখে যেতে পারেননি, পরে নবাব বংশের বেগম মুলফাজাহান এর নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সীতে এলুম। সিপাহী যুদ্ধের সময় এটা ছিল ইংরাজের আস্তানা। রেসিডেন্সীর ইতিহাস সিপাহী যুদ্ধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। এখন এটা ভগ্নাবস্থায় প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

লক্ষ্ণৌএর প্লানিং ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সামাজিক শিক্ষা, সমবায়

প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কাজের গবেষণাগার। উত্তর প্রদেশ সরকার এই গবেষণাগারের ব্যয়ভার বহন করেন। এখানে একটি নাতি বৃহৎ পাঠাগারও আছে। এদের কার্যাবলীর পরিচয় নেবার সুযোগ ঘটেছিল।

লক্ষ্ণৌএর বোটানিক্যাল গার্ডেনটি ছোট হলেও দেখবার জিনিষ। এখানে উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে নানারকম শিক্ষণ ব্যবস্থা ও গবেষণার কাজও চলছে। সবচেয়ে কৌতূহল উদ্রেক হল মাটি ছাড়া গাছের চাষ দেখে। বড় বড় আধারে সার মিশ্রিত জল রেখে বিনা মাটিতে নানারকম গাছের চাষ করা হয়েছে। আমাদের দেশে শখ করে অনেকে ছাদে গাছ লাগিয়ে রাখেন। কেউ কেউ বা ছাদে টব বসিয়ে গাছ রোপন করেন। কিন্তু মাটিহীন গাছের চাষ এই প্রথম দেখলুম। নানারকম ফুল, টমাটো, বাঁধাকপি, বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদির চাষ করা হয়েছে এবং ফসলও হয়েছে প্রচুর।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটা সুরম্যস্থানে পিকনিকের ব্যবস্থা হল। আহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে করেই আনা হয়েছিল। মহিলারা পরিবেশনের ভার নিলেন। সদলবলে হৈ চৈ করে ভোজন পর্ব সমাধা হল। পিকনিকের জন্য পূর্ব থেকে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।

নানারকম গাছ ও তার চারাগুলো পর্যবেক্ষণ করে বেড়াতে লাগলুম। বোটানী সম্বন্ধে শিক্ষণ ও গবেষণাগারটীও দেখলুম। পরিকল্পনা অনুপম, কিন্তু এখনও এর কাজ আরম্ভ হয়নি।

এসে পড়লুম মিউজিয়মে। মিউজিয়মটি ছোট, দুভাগে বিভক্ত এবং দুটি ভিন্ন স্থানে স্থাপিত। এর একটা অংশই দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। পুরাতন মিশরীয় মমিও একটা আছে এখানে। মহেঞ্জো-

দারের প্রাচীন দ্রব্যাদি, প্রাচীন মুদ্রা ও প্রস্তরমুর্তি কিছুটা দেখা গেল। এছাড়া সম্প্রতি আবিস্কৃত হিমালয়ের অন্তর্ভুক্ত রূপখণ্ডে নরদেহের বিভিন্ন অংশও সংগৃহীত দেখলুম।

লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানা দেখলুম। চিড়িয়াখানাটি ছোট, বাহুল্য নেই কিন্তু বৈশিষ্ট্য আছে। জীবগুলিকে প্রাকৃতিক পরিবেশে রাখবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ব্যাঘ্র পুঙ্গবকে দেখলুম। খাঁচার বাইরে একটা গাছতলার ঝোপের আড়ালে অকাতরে নিদ্রামগ্ন। ছোটখাট গাছপালা অনেকটা জঙ্গলের পরিবেশ রচনা করেছে। অনেকখানি জায়গা সার্কাসের রেলিংএর মত ঘেরা। তার মধ্যে রয়েছে গাছপালা আর বাঘের ঘর। মনের মত এরা বাইরে থাকবার সুযোগ পায় কিন্তু বাইরে যেতে পারে না।

হস্তী পুঙ্গবটি কিন্তু খাঁচার বাইরে এবং মানুষকে স্বীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে দু আনা দক্ষিণা নিয়ে থাকে। বন্ধুদের অনেকেই হস্তী আরোহণে ব্যাপৃত হলেন।

এখানে একটা লনে এসে আমরা বসলুম। বৈকালিক চা ও জলযোগের ব্যবস্থা এখানেই সেরে নেওয়া হল। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছিল। আমরা ফিরলুম। বাস ফিরে এল দ্রুতগতিতে শহরের একপ্রান্তে।

নীলোখেড়ি

দিল্লী থেকে রওনা হয়ে নীলোখেড়িতে এসে পৌঁছলুম রাত নটায়। দিল্লী থেকে দূরও বেশী নয়; একশ মাইলেরও কম। ছোট একটা রেলষ্টেশন। গাড়ী থামে খুব কম সময়। কাজেই খুব তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হল।

পথে দেখলুম পানিপথের বিরাট ক্ষেত্র। এখানে অনেকবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। হিন্দু মুসলমান, মোগল পাঠান ইত্যাদি অনেক রাজা বাদশাহ এখানে যুদ্ধে হেরে গিয়ে স্বীয় রাজ্যভার পরহস্তে অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য নির্ণয়ের মাপকাঠি।

বিশাল এই রণক্ষেত্র এখন শস্যক্ষেত্রও মানুষের আবাসে পরিণত হয়েছে। পানিপথ, শোনেপথ শুধু নামেই প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করছে। মাঝে মাঝে দেখা যায় সুউচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ; হয়ত কোন যুগে এর আড়াল থেকেই প্রচণ্ড অভিযান চলেছিল। অভিযান প্রতিহত করবার প্রচেষ্টাও কম হয় নাই, কিন্তু সবল শক্তি দুর্বল শক্তিকে বিনষ্ট করে রাজদণ্ডকে কেড়ে নিতে কসুর করেনি। শক্তির বিচিত্র খেলায় ভারতের রাজশক্তি বার বার বহিঃশত্রুর পদানত হয়েছে। ভারতের শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত

হয়েছে। কখনও বা ভারতের সঙ্গে বাইরের সংস্কৃতি এসে মিশে গেছে। বৈচিত্র্যময় ভারতের ভাগ্য নির্ণয়ের রক্তচিহ্ন বহন করছে এই পানিপথ বার বার। ইতিহাসের কথা মনে পড়ায় বার বার এই রণক্ষেত্রের দিকে চেয়ে রইলুম।

নীলোখেড়ির কথাও কতবার শুনেছি। বর্ধিষ্ণু অঞ্চল এটা। জঙ্গল কেটে এই শহর নির্মাণ করা হয়েছে। দেশ বিভাগের পর বাস্তুত্যাগীদের দল আশ্রয়ের সন্ধানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল; তখন এই নীলোখেড়িই তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। বলিষ্ঠ সুদক্ষ নেতার সহায়তায় দলে দলে লোক এসে এই শহরটাকে গড়ে তোলে। তাদের কল্যাণ হস্তের স্পর্শে শহরটার শ্রীবৃদ্ধি হয়। পরবর্তীকালে সরকার থেকেও বহু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও আশ্রয়ের সংস্থান করা হয়। শহরটা ছোট কিন্তু উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দ্রুত উন্নতির পথে চলেছে।

আশ্রয় স্থানে এসে পৌছলুম। শীতটা প্রচণ্ড ভাবেই এসে ধরা দিল। ফেব্রুয়ারী মাসে যে শীতটা এমনভাবে দেখা দেবে এটা কল্পনাই করা যায় নি। হিমালয় থেকে একটা শৈত্য প্রবাহ ছুটে আসছে। হিম-শীতল বাতাস অ্যাসবেস্টসের ছাদের ফুটো দিয়ে ঘরের ভিতর হু হু করে ঢুকে পড়ছে। দরজা জানালা বন্ধ করেও নিস্তার নেই।

খাবার সঙ্গেই ছিল। কোন মতে আহার সমাধা করে বিছানায় এসে ঢুকলুম। শীতে ঠক্ ঠক্ করে গা কাঁপতে লাগল। সোয়েটারের উপর সোয়েটার চাপিয়ে, পায়ে গরম মোজা, মাথায় উলের টুপি ও লেপের উপর কম্বল চাপিয়েও শীতটাকে কাবু করা গেল না। এ যেন প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বর, হাড়ের ভিতরও কাঁপুনি লাগাতে কসুর করছে না।

ইতস্ততঃ তাকিয়ে দেখি বন্ধুবন্ধবদেরও সেই অবস্থা। সবাই গরম জামা, মোজা, কম্ফটার জড়িয়ে লেপ কম্বলের ভিতর শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত। খাটিয়ার উপরে সবারই দেহ গোল পাকিয়ে আছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। আমিও লেপটাকে ভালভাবে জড়িয়ে নিয়ে গুটিশুটি মেরে শেষটা ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে উঠেই শহরটাকে দেখতে বের হলুম। অনেকগুলো শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র আছে এখানে।

ভারতের শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকদেরও একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এখানে। কৃষি, সমবায় প্রভৃতি শিক্ষণ-কেন্দ্রের অধ্যাপকেরা এখানে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবেন। শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন প্রীতিপদ। এখনও কাজ আরম্ভ হয় নি, তবে কর্তৃপক্ষ আশা করেন, মাসখানেকের মধ্যেই কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হবে। এখানে গ্রামসেবকদের পুনঃশিক্ষা-শিক্ষণকেন্দ্রও আছে। এদের কাজ অবশ্য আরম্ভ করা হয়েছে। এই শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কৃষিযন্ত্র প্রণয়ণ কারখানা, কৃষি উদ্যান ও অন্যান্য শিক্ষণমূলক ব্যবস্থা দেখলুম।

সংস্থাধিকারিক শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রটিও দেখলুম। বিভিন্ন প্রদেশের উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিকগণ এখানে শিক্ষালাভ করেন। এঁদের সঙ্গে নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনাও হল। জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধেও ঘোর বিতর্কের অবতারণা হল। বলা বাহুল্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত আঁকড়ে থাকতে চাইলেন।

সামাজিক শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রটিও দেখলুম। শিক্ষার্থীগণ এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে সংস্থায় গিয়ে সামাজিক শিক্ষা পরিচালনার ভার নেবেন। এঁদের সঙ্গে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে নানা আলাপ

আলোচনা হল। এসব শিক্ষণ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করেন ভারত সরকার।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ মহাবিদ্যালয়ও দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এখানে খাদি ও কুটীরশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হয়। সংস্থার শিল্প বিভাগের কর্মচারীগণ এখানে আট মাস কাল শিক্ষা নিয়ে থাকেন। ওয়ার্ধা ঘানি, অম্বর চরকা, গুড় তৈরি, সাবান তৈরি, কাগজ তৈরি ও মৌমাছি পালন প্রভৃতি এই শিক্ষা দানের বৈশিষ্ট্য।

এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা নিজেদের রান্না নিজেরাই করে থাকেন। নিয়মিত ভাবে সুতো কাটাও শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধুমাত্র সুরুচির পরিচয়ই দেয় না পরন্তু মানুষ গঠণে কল্যাণ হস্ত সম্প্রসারণের সুযোগ দেয়। কর্মীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে গ্রামসেবা করতে পারে, তার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এই মহাবিদ্যালয় করে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করেন খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন, পরোক্ষে ভারত সরকার।

নীলোখেড়িতে অনেক কুটীরশিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে তাঁত নির্মিত বস্ত্রাদি উল্লেখযোগ্য। সুন্দর রঙীন চাদর, শাড়ী ও টেবিল ক্লথ ইত্যাদি মূল্যে ও চাকচিক্যের লোভনীয়তায় ক্রেতার মনোহরণ করে।

গোল মার্কেটটি দেখতে সুন্দর। এর নীচের তলায় ছোট ছোট দোকান। দোকানের সংখ্যা বাড়তির মুখে চলেছে।

বাস্তুত্যাগীদের শহর এই নীলোখেড়ি আশ্রয়দান করেছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশের বহু নরনারীকে। এরাই জঙ্গল কেটে এটাকে রম্য শহরে পরিণত করেছেন। এখন আর জঙ্গলের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায় না।

ছোট শহর, কিন্তু অনেক কল্যাণমূলক শিক্ষা, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে রয়েছে এটা। ভারতের জন সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে চলেছে। পাকিস্তান থেকেও দলে দলে লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। দেশ বিভাগের ফলে অনেক কষ্ট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে বাস্তুত্যাগীরা এখানে এসেছেন, জঙ্গল কেটে নতুন শহর পত্তন করেছেন। নিজেদের উপায়ের পথও সৃজন করেছেন। মানুষ তার নিজের চেষ্টায় নানা বিপদের সম্মুখীন হয়েও দৃঢ় পদে দাঁড়াতে পারে নীলোখেড়ি তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দেয়। তাই ছোট শহর হলেও এটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

বন্ধুবান্ধবীরা বস্ত্র ক্রয়ে মেতে গেলেন। সবার বগলে একতাড়া বস্ত্র। রং-বেরংয়ের বৈচিত্র্য মনকে আকর্ষণ করে। শ্রীমতী রায়ও কিছু কিনলেন। দু'হাতে নানা কারুকার্য-ভরা রঙ্গীন ক্রীত বস্ত্রাদি দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে হেসে বললেন, হাতের টাকা ফুরিয়ে গেল, নইলে—

হেসে বললুম, নইলে সমস্ত দোকানটাই উজাড় হয়ে আপনার বাড়ীতে চলে যেত।

হেসে উত্তর দিলেন তিনি, সত্যিই তাই। জিনিসগুলো এমন সুন্দর, দামেও সস্তা। দিল্লীতে এসব জিনিষের দাম অনেক বেশী, পাওয়াও যায় না সব সময়।

বললুম, অনেক তো কিনলেন, এসব জিনিস সব জায়গাতেই পাবেন।

আমারও দু' চারটে জিনিস কেনবার ইচ্ছে ছিল। বন্ধুবান্ধবদের পকেট উজাড় করে কেনবার প্রচেষ্টা দেখে সে ইচ্ছেটাও ক্রমশঃ প্রবল হয়ে দেখা দিল। কিন্তু পকেটের অবস্থার কথা স্মরণ করে চুপ করেই রইলুম।

বন্ধুবর বাপাইয়া অন্ধ্র প্রদেশের লোক। অত্যন্ত হিসেবী। বিশেষ কারণ না ঘটলে অর্থ ব্যয়কে অত্যন্ত অপব্যয় বলে মনে করে। হঠাৎ দেখি সেও দশ টাকা দামের বিছানার একটা বড় সুদৃশ্য চাদর কিনে ফেলেছে। রং-বেরংয়ের আকর্ষণী শক্তির একটা দুর্বার মোহ আছে।

বাপাইয়া বার বার নব ক্রীত চাদরটি আমাকে দেখাতে লাগল এবং বস্ত্র ক্রয় সমীচীন ও সুলভ হয়েছে কি না জানতে চাইল। বার বার তাকে উৎসাহ জানাতে হল এ বিষয়ে, তবু সে বার বার উল্টে পাল্টে চাদরটি দেখতে লাগল। শেষটায় বললুম আমি, আমারও একটা চাদর দরকার ছিল ওই রকম, জিনিষটাও ভাল, দামেও কম। প্রয়োজন হলে ওটা আমিও কিনে নিতে পারি।

বাপাইয়া আপত্তি জানিয়ে বললে, না, এসব জিনিস আমি নিজে বড় কিনি নে, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। এটা আমার খুব পছন্দের জিনিস, ছাড়বার নয়।

আসবার দিনে ট্রেনে উঠে উপরের বাঙ্কে বিছানা পেতে নবক্রীত চাদরটি মাথার নীচে সন্তর্পণে রেখে, অঘোরে ঘুমিয়ে প্রবল নাসিকা গর্জন করতে লাগল। ওর নাসিকা গর্জনটিও সমুদ্র গর্জনের অনুরূপ। প্যাসেঞ্জার ট্রেন এবং তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। যাত্রী দলের অনেকেই মাঝে মাঝে ঐ নাসিকা গর্জনে সচকিত হয়ে উঠে পরক্ষণেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

নিদ্রান্তে উঠে বাপাইয়া আর তার চাদরটি খুঁজে পেলেন না। যাত্রীদের ওঠা নামার অবধি ছিল না। গভীর নিদ্রার অসতর্ক মুহূর্তে সেটা অপহৃত হয়। বাপাইয়া তার বিছানাপত্র ওলট-পালট করে লণ্ডভণ্ড করল, আমরাও আমাদের বিছানা খুঁজে দেখলুম, কিন্তু চাদরটির আর কোন হদিশ পাওয়া গেল না।

বাপাইয়া গম্ভীর হয়ে গেল। সব সময়ে তার মুখে হাসি ফুটে থাকত, সে হাসিমুখও অন্ধকার হয়ে গেল।

আনন্দ দেবার চেষ্টায় বললুম, একটা চাদর হারিয়ে গেছে, তার জন্য আর দুঃখ কিসের! আর একটা কিনে নিলেই হবে।

গম্ভীর হয়ে সে জবাব দিল, চাদরটা কিনেছিলুম প্রিয়জনদের জন্য তাই দুঃখটা চাদরের জন্য, টাকার জন্য নয়।

ঘটনাটি তুচ্ছ, কিন্তু অসতর্কতার সুযোগে প্রিয় বস্তুর অন্তর্ধান হলে যে মানসিক অস্থৈর্য প্রকাশ পায়, তারই একটা পরিচিতি মাত্র।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র

নীলোখেড়ি থেকে রওনা হলুম ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে। আমাদের মোটর যান চলেছে পূর্ণ বেগে কুরুক্ষেত্রের দিকে। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,---

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসব।
মামকা পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত, সঞ্জয়॥"

কুরু ও পাণ্ডবের যুদ্ধের কাহিনী সঞ্জয় শুনিয়েছিলেন কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে। ব্যাস রচিত মহাভারত হাজার হাজার বছর ধরে সে বাণী বহন করে এসেছে। আজ আমরা চলেছি সেই সুপ্রাচীন রণক্ষেত্রে। যেখানে ধর্মযুদ্ধে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ সাধনের জন্য স্বয়ং ভগবান হয়েছিলেন অবতীর্ণ। যে ক্ষেত্রের প্রতি

ধূলিকণা শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে পূত হয়ে উঠেছিল তারই দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমরা চলেছি।

পথে পড়ল থানেশ্বর। ইতিহাসের কথা মনে এল। এখানেও যুদ্ধে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। সারা পাঞ্জাবটাই যেন রণক্ষেত্রের স্থান অধিকার করে যুগ যুগ ধরে ভারতের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। বিশাল হিমালয়ের দুর্গম পথ বেয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শক, হূন, মোগল, পাঠান এসে ভারতের বুকে হানা দিয়েছে। পাঞ্জাবের প্রাচীন রণক্ষেত্র তারই একটা সুস্পষ্ট পরিচিতি জানিয়ে দিচ্ছে। দেশের বিবদমান রাজশক্তি বহিঃশত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নি, তাই পদানত ভারতের ইতিহাসের পরিচিতি সমুজ্বল নয়। তবু অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, বিপর্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফলে বাইরের অনেক শক্তি এসে ভারতের অণু-পরমাণুতে মিশে গেছে। এইটাই একটা ভারতের বিশিষ্ট দান। পাঞ্জাবের রক্তমাখা ধূলিকণা যুগযুগ ধরে তাই ইতিহাসের উত্থান পতন নিয়েই পরিচিতি জানায় না পরন্তু মিলনের সেতুর পথেরও ইঙ্গিত জানিয়ে দেয়।

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এসে পড়লুম। মনটার মধ্যে কেমন যেন এক অপূর্ব শিহরণ সঞ্চারিত হল। এতো শুধুমাত্র একটা প্রাচীন রণক্ষেত্র নয়। এটা হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র, ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন দর্শনের মূল ধারক। হাজার হাজার বছর ধরে এরই ইতিহাস বংশানুক্রমে মানুষের মন বেয়ে নিজের পথ রচনা করে এগিয়ে এসেছে। তাই এর ইতিহাস তো কেবলমাত্র অক্ষরের সমষ্টি নয়, এর অনুভূতি মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে চিরকালের জন্য গাঁথা ও জীবন দর্শনের চরম আলস্যের বিকাশ।

যুগ যুগ ধরে মানুষ এই পৃথিবীতে এসেছে, আবার সময় হলেই চলে গেছে তারা। ভারতের মানব স্রোতও অবিরাম গতিতে অনুরূপ ভাবে চলে এসেছে। যারা এসেছিল, আজ তারা নেই। এই অফুরন্ত মানবস্রোত আসা যাওয়ার মাঝখানে চেয়েছে একটা অবলম্বন— যাকে ধারণ করে তারা বেঁচে থাকতে পারে প্রকৃত মানুষের মত। চলার পথের একটা সন্ধান পায়। অর্থ, সামর্থ্য পার্থিব যা কিছু মানুষকে দেয় সাময়িক তৃপ্তি, মনের খোরাক তাতে হয় না। মন চায় একটা দৃঢ় আশ্রয় ও জীবন পথে চলবার একটা ইঙ্গিত। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সে চলবার পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে। এর ধূলিকণা তাই এত পবিত্র, এত আদরের। এই কুরুক্ষেত্র অবলম্বন করে যে মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতগীতা মানবচিত্তে স্থান পেয়েছিল, আজ ভারতবাসীর ঘরে ঘরে তারই প্রতিধ্বনি চলছে। এতো শুধু দুই বিবদমান রাজশক্তির রণের ক্রীড়াক্ষেত্র নয়, এ যে অন্তরের জিনিষ। মানব মনের হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, উত্থান পতন, ভাঙ্গাগড়া নিয়েই এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে। মহাভারতের স্থান তাই ভারতবাসীর প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে। শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত লোকেরও পরম আদরের ধন। দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলুম। মধ্যাহ্ন ভাস্কর আকাশে দীপ্যমান। হাজার হাজার বছর আগের কথা মনে পড়ল। ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে শতাধিক মাইল দূরবর্তী এই স্থানে কুরু ও পাণ্ডবের বিপুল বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনও হয়ত সূর্যকিরণ এমনই ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের শিবিরে ছেয়ে গেছল এই বিশাল রণক্ষেত্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথী যোদ্ধা পাণ্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। নিজেদের মধ্যে এই

যুদ্ধে বিপুল আত্মীয় হননের দুঃখে অর্জুন ম্রিয়মান হলেন। পার্থসার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বাণী শোনালেন, "হে অর্জুন, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়ো না, হৃদয়ের দুর্বলতা দূর কর।" আরও জানালেন, "আমিই সমস্ত নিধন করেছি। অর্জুন, তুমি শুধু মাত্র নিমিত্তের কারণ হবে।"

শ্রীভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দেখালেন। কী ভয়াল সে রূপ! নদী যেমন প্রবল স্রোতে সমুদ্রে গিয়ে বিলীন হয়, তেমনি মানব স্রোতও তার দংষ্ট্রা করালে বিলীন হচ্ছে। কত মুখ, কত বাহু, কত নেত্র, অনন্তরূপ তাঁর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সবই তাঁর দংষ্ট্রা করালে করালে লগ্ন। অর্জুন ভীত, ত্রস্ত হত বুদ্ধি হয়ে স্তুতি জানাল।

দংষ্ট্রা করালানিচতে মুখানি দৃষ্টৈ্ব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভেচ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।

শ্রীভগবান আবার সাম্যমূর্তি ধারণ করে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী হলেন। অর্জুন তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।

শ্রীভগবান তাঁকে জানালেন,

মৎকর্জন্তন্মৎপরমো মদ্ভক্ত সঙ্গ বর্জিতঃ।
নির্বৈর সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পণ্ডিত॥

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন,

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥

এই তো লীলা বৈচিত্র্য। শ্রীভগবান পূর্ণাবতার হয়ে মানবদেহ পরিগ্রহ করেন, হাসি কান্না সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে ভগবৎ আদর্শ প্রচার করেন, আবার ধর্ম সংস্থাপন হলেই তিনি মানবদেহ ত্যাগ করে

স্বধামে ফিরে যান। মানুষের জন্য রেখে যান তাঁর বাণী, তাঁর আদর্শ, তাঁর শিক্ষা, মানুষের অন্তরে দিয়ে যান আনন্দের আভাস। তাইতো তাঁকে বলা হয় সচ্চিদানন্দের মূর্ত বিগ্রহ।

বিভিন্ন পর্বে মহাভারত রচনার মূল কেন্দ্র এই কুরুক্ষেত্র। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গড়ে উঠে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা। হিন্দুদের এই ধর্মগ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ। এর প্রতি অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ। এর প্রত্যেক ছন্দ মানুষের মনে দোলা দেয়, এনে দেয় অনাবিল তৃপ্তির আভাস। বিভিন্ন অধ্যায়ে ধর্মের মূলনীতি ও সাধনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারত ও মহান ভারতের সুস্পষ্ট পরিচিতি। নানা ধর্মোপাখ্যান এই মহাকাব্যের সৌষ্ঠব বর্ধন করছে। তাই এই সর্বজন বোধগম্য গ্রন্থ ভক্তের অন্তরের ধন, গুনগ্রাহীজনের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক—মধ্যাহ্ন ভাস্করের যে দীপ্যমান দীপ্তি নিয়েই মানব মনে সমুজ্জ্বল।

এই পবিত্র ধর্মক্ষেত্রে এসে তাই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, আনন্দের আতিশয্যে হতবাক্ হয়ে চারিদিকে চেয়ে রইলুম। উপলব্ধি জিনিসটা অন্তরের, ভাষায় রূপদান করা কঠিন। মনে হল, অনেক দিন ধরে যে হারানো মূল্যবান জিনিসটার সন্ধান করছিলুম, আজ যেন সেটা পেয়ে গেলুম, হয় তো অনুভূতিটা তার চেয়েও সুদূর প্রসারী। ছোট বেলায় মহাভারত পঠনে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে যে জিনিসটা দানা বেঁধেছিল, আজ যেন সেটা চোখের সামনে এসে ধরা পড়ে গেল। কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্র যেন একটা নির্জীব মাঠ নয়, এর প্রত্যেকটি ধূলিকণা সজীব হয়ে প্রাচীন অথচ চির-আকাঙ্ক্ষিত চিত্রটি আমার চোখের সামনে তুলে ধরল।

চমক ভাঙ্গল বন্ধুদের আহ্বানে। সময় নেই, চলে যেতে হবে কর্তব্যের তাগিদে।

সামনে একটা বড় সরোবর। সেখানে গিয়ে হাত ডুবিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করে মাথায় খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলুম। তারপর প্রশান্ত চিত্তে শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করলুম। খানিকটা পথ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল। একটু উঁচু জায়গায় মন্দির স্থাপিত।

এর পাশেই একটা মহাবিদ্যালয়। শুনলুম ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সেখানে আছে। সরোবরের আশে পাশে আরও অনেক মন্দির। মা দুর্গারও একটি মন্দির দেখলুম। মায়ের দর্শন লাভ করে আমরা আবার বাসে চেপে রওনা হলুম জ্যোতিঃসরে।

জ্যোতিঃসর বা জ্যোতি সরোবর কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণের মধ্যস্থলে। বিষ্ণু মন্দির হতে কয়েক মাইল দূরে কুরুক্ষেত্রে একটা রেল স্টেশনও আছে, কিন্তু সেখানে অবতরণ করলে বিষ্ণু মন্দির অথবা জ্যোতিঃসরে যেতে হলে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয়।

জ্যোতিঃসর! এই সেই স্থান যেখানে শ্রীভগবান অর্জুনকে শুনিয়ে ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বাণী। একটা বোধিদ্রুমের তলায় শ্রীকৃষ্ণের পার্থসারথী বেশে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এর নিকটেই হিন্দু মিশনের স্থাপিত গীতা মন্দির। হিন্দু মিশনের সন্ন্যাসী জানালেন, বোধিদ্রুমটা যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে এখানেই রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এরই তলায় শ্রীভগবান তার ভাগবত বাণী অর্জুনকে শুনিয়ে ছিলেন। বোধিদ্রুমের পাশেই জ্যোতিঃসর। এই সরোবরেই বিশ্বরূপের ভগবৎসত্ত্বা বিলীন হয়েছিল। জ্যোতিঃসর নামের উৎপত্তি সে থেকেই হয়েছে। বোধিদ্রুমের মন্দিরের চারি পাশ প্রদক্ষিণ করলুম। অক্ষয় বটের এই সুপবিত্র স্থানে যে আনন্দের আভাস পেয়েছিলুম, সেটা অনির্বচনীয়। বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সবাই আনন্দের আভাসে সমুজ্জ্বল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে সরোবর থেকে খানিকটা জল নিয়ে মাথায় দিলুম। মনটা আনন্দে ভরে গেল। বন্ধুবান্ধবেরা সবাই প্রকাশ করলেন, আজকের এই আনন্দের আভাসের কথা তাঁরা জীবনেও ভুলতে পারবেন না।

জ্যোতিঃসরের আশেপাশে হিন্দু মিশনের স্থাপিত অনেক মূর্তি আছে। সরস্বতী দেবী, মহাদেব, রামজী ইত্যাদির মূর্তিও দর্শন করবার সৌভাগ্য হল।

গীতা মন্দিরে দেখলুম শ্রীমদ্ভাগবত গীতার যুদ্ধের বিষয় অবলম্বন করে নানা মূর্তি রচনা। কোথাও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কোথাও পার্থ ও পার্থসারথী, কোথাও বা অন্যান্য পাণ্ডবদের মূর্তি নানান ভাবে নানা ঘরে স্থাপনা করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি মূর্তির সঙ্গে গীতার বিষয় বিজড়িত। লোকশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় এই সব মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

হিন্দু মিশনের জ্যোতিঃসর শাখার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎস্বামী সত্যানন্দজীর সঙ্গে আলাপ হল। বড় মিষ্টভাষী তিনি। বিশ বছর ধরে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গীতাধর্মের বিকাশ সাধনের জন্য এইখানেই বাস করছেন। সুন্দর সৌম্য মূর্তি, মাথায় চূড়া পরে কেশ সজ্জিত রাখেন।

আমাদের সাদরে আশ্রমে নিয়ে গেলেন তিনি। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা হল। ভগবৎ সাধনার অনুকূল স্থান এই জ্যোতিঃসরের প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অসীম।

প্রতি বছর ভারতের নানা স্থান থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর এখানে সমাগম হয়। ভক্তগণ শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে এই পবিত্র ভূমি ও ভগবৎ গীতার প্রতি ভক্তি জানায়। সূর্য গ্রহণের সময়

লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এখানে। হিন্দু মিশনের সন্ন্যাসীরা তীর্থ যাত্রীদের সেবা করেন। পবিত্র বোধিক্রমতলে ও গীতা মন্দিরে উদাত্ত স্বরে গীতা পঠন হয়।

সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলুম। যাবার আগে পবিত্র বোধিক্রুমটার দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। জীবনে আর দর্শনের সুযোগ হবে কিনা জানিনে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রে আর জ্যোতিঃসরে যা দেখে গেলুম যা আনন্দের আভাস পেলুম, এ তো হারাবার জিনিস নয়। এ যেন অন্তরে গাঁথা রইল। যাবার পথে তাই মনে হল, এ তো বিদায় নয়, এ যে অন্তরের মধ্যে বয়ে নিয়ে যাওয়া। মানব স্রোতে ভেসে চলেছি, বিশ্বরূপের মহা সমুদ্রে একদিন বিলীন হতেই হবে। কিন্তু আজ যে রূপটার পরিচয় নিয়ে গেলুম, সেটুকুও হবে আমার স্রোতপথে চলবার পাথেয়। যাবার বেলায় তাই প্রণাম জানালুম সেই বিশ্বময় অনন্তরূপকে,—

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাস্বতঃ ধর্মগোপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতোমে॥"

অম্বালা ও চণ্ডীগড়

নীলোখেড়ি থেকে অম্বালার রেল স্টেশনে এসে পৌঁছলুম কাল বেলায়। দিল্লী থেকে এর দূরত্ব একশ মাইলের উপর। ম্বালা পূর্ব পাঞ্জাবের একটা বড় শহর। স্টেশনটাও বড় একটা ংসন স্টেশন।

চা ও জলযোগ সমাপ্ত করে শহর দেখতে বের হলুম। প্রচু
বাস্তুত্যাগী এসে এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। শহরের বিশে
কোন বৈচিত্র্য নেই। মাঝারি গোছের শহরে যা যা থাকা
প্রয়োজন সবই আছে। সেই চিরন্তনী দোকান-পাটের সমাবেশ
মানুষের ভীড়, জন-কোলাহল ইত্যাদি সমভাবেই আছে। হিন্দু ও
জৈনদের কয়েকটা মন্দির দেখলুম। দেখবার জিনিস সে সব। গঠনে
কারুকার্য ভাল।

অম্বালার রাস্তাগুলি সুপরিসর, অবশ্য এগুলির বহু শাখা গলিপথও
রয়েছে।

একটা বৈঠকে যোগদান করলুম। পাঞ্জাবের সামাজিক শিক্ষা
বিস্তার সম্বন্ধে নানা আলোচনা হল। সামাজিক শিক্ষা জাতি গঠনের
কাজের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। এ শিক্ষা শুধু মাত্র গণতন্ত্রের বাহক
নয়, এ জাতিকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। এ শিক্ষা মানুষের
মনের শুভ চেতনার উদ্বোধক।

সামাজিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাঞ্জাব এগোবার চেষ্টা করছে। নানা
প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়েও এদের প্রচেষ্টার অগ্রগতির পরিচয়
পাওয়া যায়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গও অনেকটা এগিয়ে
গেছে। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য প্রশংসনীয়।

জলযোগান্তে মোটর যানে চণ্ডীগড়ের পথে রওনা হলুম। দু'ধারে
গম ও ভুট্টার ক্ষেত। মাঝে মাঝে সরষের ক্ষেতও দেখা গেল।
এ ছাড়া আছে আরও অনেক রকম রবিশস্য। পাঞ্জাব পূর্বে ছিল
অনুর্বর, কিন্তু পঞ্চনদ সেচনের কল্যাণে এই প্রদেশ বহুদিন আগে
থেকেই উর্বরতা লাভ করে বিপুল শস্য ভাণ্ডার সৃজনের সহায়ক
হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবের অনুর্বরতা দূর করবার জন্য ব্যাপকভাবে

জল সেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নদীপথ থেকে খাল কেটে মাঠে জল নেবার ব্যবস্থাপনায় পূর্ব পাঞ্জাবের ভূমি আর মোটেই অনুর্বর নয়।

মোটর যান প্রশস্ত রাজপথে ছুটে চলেছে। দুধার থেকে রাস্তার গাছপালা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। গাছপালাগুলো অনেকটা বাংলা দেশেরই মত, তবে আম কাঁঠাল বড় একটা দেখতে পাওয়া গেল না।

দীর্ঘ সালোয়ার পায়জামা আর ওড়না পরে পাঞ্জাবী রমণীরা স্বীয় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা। পাঞ্জাবে পর্দা-প্রথা নেই, তাই পাঞ্জাবী মেয়েরা স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করতে পারেন।

পাঞ্জাবী পুরুষেরা বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। অধিবাসীদের মধ্যে শিখ ও হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। এঁদের সকলেই পায়জামা, মেরজাই ও পাগড়ী পরেন। শিখেরা দীর্ঘ শ্মশ্রু ও কেশ ধারণ করেন। চুলগুলো চূড়ো করে বেঁধে পাগড়ীর অন্তরালে রাখেন। গ্রামাঞ্চলে দড়ির খাটিয়ায় শয়ন, উপবেশন ও গড়গড়ায় প্রকাণ্ড কলকেয় তামাক সেজে ধূমপান এদের উপভোগের বস্তু।

চণ্ডীগড়ে এসে পৌছলুম অপরাহ্ণে। পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী চণ্ডীগড়। দেশ বিভাগের ফলে লাহোর পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নতুন ভাবে এই সহরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। এখনও সহরটা সম্পূর্ণরূপে গড়ে ওঠে নি।

রাজধানী সহর, আকারেও তাই বড়। নানান অঞ্চলে বিভক্ত। আধুনিক সহর, তাই ঘরবাড়ীগুলোও আধুনিক পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটগুলি বেশ প্রশস্ত ও সুন্দরভাবে নির্মিত। চারি দিক ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বেশ পরিপাটি সুন্দর সহর।

পরিবেশটিও সুন্দর। পর্বতমালার সানুদেশে সহরটির স্থাপনা। দিগন্তের চক্রবালে পর্বতমালা অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভায় বিচ্ছুরিত হয়ে উঠে। চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নতুন ধরণের বাড়ীগুলো শুধু মাত্র সহরের সৌষ্ঠব বর্ধন করে না, পরন্তু দ্রষ্টার মনেও একটা সুষ্ঠু অনুভূতির প্রেরণা জাগায়।

পূর্বে লোকালয় ছিল খুব কম। ধূ ধূ করত মাঠ। বর্তমানে জন কোলাহল মুখরিত। প্রয়োজনের তাগিদে এমনি কত সহর গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বুকে। বিরাট সৌধ; উজ্জ্বল দীপাবলীতে শোভিত হয়েছে সে সহর। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সে জনবহুল সহরেরও পতন ঘটেছে। কোথাও তার অস্তিত্বের পরিচয় পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথাও বা তার ভগ্নাবশেষ পুরাতত্বের অঙ্গীভূত হয়ে প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। নালন্দা, মহেঞ্জোদরো, হরাপ্পা এ সবেরই পরিচিতি বহন করে আসছে। শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল-গুলি কালগর্ভে লীন হওয়ায় এখন শুধু ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়েই তার পরিচিতির আভাস জানায়। চণ্ডীগড়ের এই যে নতুন সহর বিচিত্র রূপ নিয়ে গড়ে উঠ্‌ছে, হয়ত বা অদূর ভবিষ্যতে বিপুল আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এরূপ আরও স্পষ্টতর হয়ে দেখা দেবে কিন্তু কালের কুটিল গতিতে এই চিত্তচমকপ্রদ সহরের কি রূপ হবে, তার পরিচিতি জানাবে সুদূর ভবিষ্যতের ইতিহাস। কিন্তু মানুষের কারবার বর্তমান নিয়ে, সুদূর ভবিষ্যতের ভাবনা তার করা চলে না বর্তমানের প্রাচীনতাই হবে সুদূর ভবিষ্যতের বর্তমানের ইতিকথা মানুষ তাই গড়েই চলে, ভাঙ্গার কথা ভাবে না।

বাসটি এসে থামল গোল মার্কেটের সিনেমা হাউসের পাশে ম্যাটিনী শো তখন সবেমাত্র ভেঙ্গেছে। দলে দলে পাঞ্জাবী মেয়ের

বের হয়ে আসছে। এদের কেউ কেউ সাইকেলে চড়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল। পাঞ্জাবীরা ক্রীড়ামোদী জাতি, মেয়েরাও অগ্রগামী, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করেন।

আহারের ইচ্ছা প্রবলভাবেই দেখা দিল। বন্ধুবান্ধবসহ গোল মার্কেটে ঢুকে পড়লুম। খাবার দোকানের সন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই, সামনে পড়ল, "অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার।" নামটা পরিচিত। টিকিট করে খাবার নিতে হয়। বাংলা নামের সঙ্গেও একটা সাদৃশ্য আছে। এদের শাখা প্রশাখাও ভারতের নানাস্থানে আছে। টিকিট কিনে খাবার ঘরে প্রবেশ করলুম।

ও হরি! নামটা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার হলেও অন্নের এক কণাও দেখ্‌তে পেলুম না। রুটি, সবজী, দহি ও মিষ্ট দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করে, তৎসহ চা পানটাও সেরে নিলুম। দুটো কাজই একসঙ্গে সারতে হল। দোকানপাটগুলো আবার রাত আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। এর পর আর খাবার মিলবে না।

রাতে শয়নের ব্যবস্থা হল একটা শিক্ষণ শিক্ষা বিদ্যালয়ের হোস্টেলে। নীলোখেড়ি থেকে অনেক উত্তরে এসেছি। নীলখেড়ি থেকে অম্বালা পঁয়ত্রিশ মাইল। চণ্ডীগড় অম্বালা থেকেও চল্লিশ মাইল দূরে। ভাবলুম শীতের প্রকোপটা আরও বেশী হয়েই দেখা দেবে। নীলোখেড়িতে যা শীতের প্রকোপ সহ্য করে এসেছি, এখানে রাত কাটানো আরও দুরূহ হবে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, রাতের শীতটা তীব্র হলেও নীলোখেড়ির তুলনায় কিছুই নয়। সম্ভবতঃ পর্বতমালা শীত প্রবাহের গতি অনেকটা রোধ করায় শীতটা একটু কম হয়েই দেখা দিয়েছিল। তারিখটা ৬ই ফেব্রুয়ারী, কাজেই শীতের প্রকোপটা তীব্রই থাকার কথা।

দূরে রেলের বাঁশী বেজে উঠল। চণ্ডীগড় রেলপথেও যাওয়া চলে। লেপের তলায় ঢুকে গাড়ীর ঘর্ঘর ধ্বনি শুনতে লাগলুম।

প্রত্যূষে উঠে প্রাতঃ কার্য সেরে নিলুম। শিক্ষণ বিদ্যালয়ের দুজন পাঞ্জাবী শিক্ষার্থী বারান্দায় অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। তাঁরা রাত্রি যাপন করেছেন বারান্দায়। এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বারান্দায় কি করে রাত্রিযাপন করা যায় ভেবে আশ্চর্য হলুম। অভ্যাস না থাক্‌লে শীতে প্রচণ্ড কষ্ট পাবারই কথা।

পরে প্রকাশ পেল, বন্ধুবর বাপাইয়া ও শর্মার নাসিকা গর্জনের ঘোর নিনাদে ভীত, ত্রস্ত ও বিরক্ত এই পাঞ্জাবী শিক্ষার্থীযুগল উপায়ান্তর না দেখে দ্বিপ্রহর রাত্রেই খাটিয়া বহন করে বাইরে এসে রাত্রি যাপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। বস্তুতঃ এই উভয়ের নাসিকা গর্জন সমান তালে শুরু করলে সেটা যে কত ভীতিপ্রদ ও অস্বস্তিকর হতে পারে, এ ঘটনা তার জ্বলন্ত নিদর্শন।

বন্ধুবর বাপাইয়াকে এ ঘটনা জানাতে তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে বলে উঠল সে, অসম্ভব! আমার নাক ডাকল, অথচ আমি কিছু জান্‌তে পারলুম না। এ অবিশ্বাস্য ও অন্যায় দোষারোপ, নিজের কানকে তো আমি অবিশ্বাস করতে পারিনে, আর আমি যে কম শুনি, একথা আমার অতি বড় শত্রুতেও বলতে পারবে না। তবে শর্মার নাক ডাকে, এবং সে গর্জন অসহ্য।

শর্মাকে জানালুম একথা। উত্তর দিল যে, বাপাইয়া ঘুমোলে একবার এ ঘরে এসে শুনো, ওতো শুধু মাত্র নাক ডাকা নয়, যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মহা সমুদ্রের টর্ণেডো, আর সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত। মাত্র দুজন উঠে বাইরে গেছে আমি ভেবেছিলুম ওর নাক

চাকার কল্যাণে ঘর খালি হয়ে যাবে। আমার নাক ডাকা। রামদা
জানেন, একদিনও শুনিনি। বাপাইয়া করল দোষ, আর সেটা চাপান
চ্ছে আমার ঘাড়ে। অন্যায়—

অগত্যা নিরস্ত হলুম একথায়। বন্ধুবান্ধবেরা পরিহাস করে
নালেন তা ঠিক, তা ঠিক, কেউ মিছে বলেনি। অন্যায় দোষারোপ
রা উচিত নয়।

সদলে আবার শহর দেখতে বের হলুম। ঘরবাড়ীগুলো
র্বত্রই ছড়ানো। মাঝে মাঝে ফাঁকা মাঠ। গাছপালা নেই বললেই
য়। নতুন করে গাছপালা লাগানো হচ্ছে। শহরের প্রান্ত ঘিরে
রে আকাশের গায়ে পাহাড়গুলো ঘনকৃষ্ণ মসীরেখার মত শোভা
াচ্ছে।

নতুন সেক্রেটারিয়েট ভবনটি দেখলুম। প্রকাণ্ড দশ তলা বাড়ী।
নুমতির অভাবে ভিতরটা দেখা গেল না। অনেকটা পশ্চিম বাংলার
নির্মিত সেক্রেটারিয়েট ভবনের মত; তবে নির্মাণে কিছুটা অভিনবত্ব
য়েছে। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ি নেই। পাহাড়ী ঢালু পথের মতই
মা উঠার রাস্তা। এর নির্মাণ কার্য এখনও মহা সমারোহের সঙ্গে
ছে।

হাইকোর্ট ভবনটি দেখলুম। ভবনটি ছোট, কিন্তু আধুনিক
পত্যে রচিত ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ব্যবস্থা বেশ পরিপাটি।
ভবনটিরও সিঁড়ি নেই। ঢালু পথ দিয়ে উঠা নামা করতে হয়।
পাশে একটা কৃত্রিম জলাশয় আছে।

শহরের গৃহবিন্যাস মনোরম ও শৃঙ্খলার পরিচায়ক। সবগুলি
ড়ীই নতুন, রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। গলি পথ, ভিড় ও
পরিচ্ছন্নতার বালাই নেই।

শহরের আরও দু এক অঞ্চল ঘুরে মোটর যান রওনা হল আমাদে
গন্তব্য পথে। জানালা দিয়ে বিলীয়মান শহর ও দূরের পর্বতমালা
দিকে তাকিয়ে রইলুম।

পিঞ্জর উদ্যান

পিঞ্জর উদ্যানের দিকে চলেছি। মোটর যান চল্‌ছে পাহাড়ী পথ
বেয়ে। চণ্ডীগড় থেকে কয়েক মাইল দূরে এই পিঞ্জর উদ্যান।

দূরের পাহাড় ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। পাহাড়গুলো খুব উঁচু
নয়। দূরে পাহাড়ের গায়ে দু'-চারটে বাড়ী দেখা যাচ্ছে। কখনও
বা হাল্‌কা মেঘ পাহাড়ের গা বেয়ে নীল আকাশে ভেসে চলেছে।
নীচু পাহাড়ের গা বেয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ ক্ষেত। নিস্তব্ধতা ভেদ
করে শুধু মোটরযানের অবিরাম ঘর্ঘর ধ্বনি কানে ভেসে আসতে
লাগল।

অম্বালা থেকে চণ্ডীগড় আসবার পথে পড়ে রূপার সহর।
পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে এই সহর। অনেকটা দার্জিলিংএর অনুরূপ;
অথচ অত উঁচু নয়। সমতল ভূমির উপর অনুচ্চ পাহাড়, রূপার
সহর তারই গা বেয়ে গড়ে উঠেছে। ফিরতি পথে রাতের অন্ধকারেও
দেখেছিলুম এই সহর। বিজলী-শোভিত সহরটিকে মনে হয়েছিল নীল
আকাশে তারকা খচিতের অনুরূপ। দূর থেকে এদৃশ্য মনকে বেশ
মুগ্ধ করেছিল।

মোটরযান এসে পড়ল পাহাড়ের ভিতর। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে

পিছনে চারিদিকেই পাহাড় ঘেরা। হিমাচলের একটা অংশ এই পর্বতমালা। সমুদ্রের ঢেউএর মত একটার পর একটা পাহাড়ের চূড়া আকাশের গায়ে লেপা।

চারিদিকের পাহাড়ের মাঝখানে অর্ধ-সমতল ভূমি। চারিদিকের সুন্দর পরিবেশ মনের ভিতর একটা স্নিগ্ধতার সঞ্চার করে। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলুম।

সহসা ভেসে উঠল, বিশাল একটা পাথরের প্রাচীর। জিজ্ঞেস করলুম, মনোরম এই পরিবেশের মধ্যে মানুষের হাতে গড়া এই প্রাচীর বেষ্টনী কেন?

উত্তর পেলুম, আমরা পিঞ্জর উদ্যানে এসে পড়েছি, এটা তারই প্রাচীর।

এই পিঞ্জর উদ্যান! এখানেই রয়েছে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রম্য উদ্যান। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, পিঞ্জর নামের স্বার্থকতা আছে বটে। চারিদিকে রয়েছে দুর্ভেদ্য পর্বতশ্রেণী, তারই মাঝে এই সুরক্ষিত রম্য উদ্যান। চারিদিকের পরিবেশ ও রমনীয়তা একে আরও সুশোভিত করে তুলেছে। রম্য উদ্যান রচনার যোগ্য স্থান বটে।

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই সৌন্দর্য রস-পিপাসু। যাঁদের সামর্থ নেই, জীবন সংগ্রামে যাঁরা অহরহ ব্যাপৃত, তারাও কর্মক্লান্ত দিবসের অবসানে দু'নয়ন ভরে উপভোগ করেন জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবীর অপরূপ রূপ, অথবা অমাবস্যার অন্ধকারে তারকা-খচিত নীল আকাশ। মানুষের স্বভাবই এই। দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন জোয়ারের জলের মত মানুষের মনে চেপে তার সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নষ্ট করবার ব্যবস্থা করতে কোন ত্রুটি রাখে না সত্য, কিন্তু তবু যেন দু'কূল ছাপিয়ে সৌন্দর্যরস-পিপাসু মন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতির জন্য

ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আশেপাশের পরিবেশই তার মনের খোরাক জুগিয়ে দেয়। প্রকৃতির সঙ্গে নিজের মনের নিবিড় সংযোগের জন্য সে ব্যাকুল হয়।

আর একদল মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান নানাভাবে। কেউ বা নিতে চান বিভিন্ন রূপের পরিচয়। ছুটে বেড়ান তারা পৃথিবীর নানা স্থানে সৌন্দর্যের সন্ধানে। কেউ বা চান সৌন্দর্য সৃষ্টি করে উপভোগ করতে। এ সৌন্দর্য বোধ রূপায়িত হয় জীবনের প্রতি ছন্দে, প্রতি কর্মে। এর কতকটা সার্বজনীন, কতকটা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবদান। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ কর্মের মধ্যে সৌন্দর্য রূপায়িত করে বিমল আনন্দ অনুভব করেন।

যাঁদের অর্থ-সামর্থ আছে, তাঁরা চান অন্যের সাহায্যে নিজের সৌন্দর্যের কল্পনাকে যতটা সম্ভব রূপদান করতে। পিঞ্জর উদ্যান এইরূপ একটা অভিব্যক্তির প্রকাশ মাত্র। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় পরিবেশে মানুষে গড়া সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসের প্রতীক এই পিঞ্জর উদ্যান।

মোটর যান এসে থামল পিঞ্জর উদ্যানের গেটের সামনে। সদলবলে বাস থেকে নেমে পড়লুম।

অনেকটা জায়গা জুড়ে এই উদ্যান রচনা করা হয়েছে। চারিদিকের পর্বতমালা আর তার মাঝে এই দীর্ঘস্থান জুড়ে এই সুদীর্ঘ প্রস্তর প্রাচীর স্থানটির নিরাপত্তার পরিপোষক।

উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। উদ্যানটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা অংশ থেকে আর একটা অংশে যেতে হলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতে হয়। প্রত্যেক অংশেই বৃহৎ একটা

উদ্যান ফল ফুলে ভরা। মাঝখানে রয়েছে দীর্ঘ কৃত্রিম জলাশয় ও তার মধ্যে ফোয়ারা। পাঁচটি জলাশয় ও তার ফোযারাগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। উঁচু পাহাড়ের গা কেটে পাঁচটি উদ্যান থাকে থাকে সজ্জিত করা হয়েছে। একটা জলাশয় থেকে আর একটা জলাশয়ে জল নেবার ব্যবস্থাও সুন্দর। জলাশয়ের গা বেয়ে মানুষের চলার পথ।

মাঝখানে রয়েছে সুন্দর একটা ভবন। মার্বেল পাথরের মেঝে ভবনটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। এখানে দাঁড়ালে সমস্ত উদ্যান ও আশেপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। জুতো খুলে রেখে সবাই মার্বেল পাথরের মেঝেয় দাঁড়িয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। পিঞ্জর উদ্যানের রম্য দৃশ্য ও চারিদিকের লোভনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ মনটাকে উৎফুল্ল করে তুলল।

ক্রমশঃ নীচে নামতে লাগলুম। একটার পর একটা এমনি করে পাঁচটা অংশই বেশ ভাল করে দেখেনিলুম। সিড়ি বেয়ে পর পর অনেকটা নীচে নেমে আসতে হল। উপরে উঠবার সময় হয়ত কষ্ট হবে। কিন্তু সৌন্দর্যের মহিমময় অবদানে, সে কষ্টের কথা ভুলে গেলুম। যে দিকেই তাকানো যায়, অফুরন্ত সৌন্দর্য এসে চোখের সামনে ধরা দেয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর চিত্ত বিনোদনের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন এই রম্য উদ্যান। পরিবেশ পরিচিতি ও রম্যতায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী মনের পরিচায়ক এই উদ্যান। পৃথিবীর আলো নূরজাহানের সঙ্গে দীর্ঘকাল এখানে তিনি কাটিয়ে গেছেন। তখন এ স্থান ছিল আরও আনন্দ-মুখর। উদ্যানে হয়ত ফুটত বসোরাই গোলাপ। ফোয়ারাগুলোও ছিল চঞ্চল। রামধনুর রং খেলে যেত ফোয়ারার জলের উৎসে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব সৃষ্ট সৌন্দর্য মিলে এক অভিনব অনির্বচনীয় রূপের বিকাশ হতো।

কালের কুটিল চক্রে সে রম্য পরিবেশের অবসান ঘটেছে; কিন্তু সবটা বিলুপ্ত হয় নি। এখন আর ফোয়ারা জল রামধনু সৃষ্টি করে না। কৃত্রিম জলাশয়গুলোও শুষ্ক। বাগানের সেই অপরূপ শোভাও আর নেই। সে জাহাঙ্গীরও নেই, নূরজাহানও নেই। মোগল বাদশার রাজ্যও অস্তমিত। কালের কবলে সবই গেছে। এখন ভারত সরকার পুরাকীর্তি হিসাবে এ স্থানটি সংরক্ষণের ভার নিয়েছেন। শুধু মাত্র এটা যা ছিল, তারই একটা ক্ষীণ পরিচিতির আভাস জানিয়ে দেয়।

সব হারিয়ে গেলেও মনোরম পরিবেশের সাহচর্যের সৌন্দর্যটুকুর যা পরিচয় পেলুম, তাতেই মনটা ভরে গেল। জন কোলাহল আজ নেই। পুরাকীর্তির অবশেষের মাঝে বিরাজ করছে নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা। অদূরে পর্বতমালা দৃঢ় সেনানীর মত এই নিস্তব্ধতার মাঝেই প্রহরায় নিযুক্ত। সৌন্দর্য দূত বার বার এসে কানে কানে জানিয়ে দিচ্ছে, এইখানে আপন ঐশ্বর্য নিয়ে বাস করছে। মানুষ এসে তার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল। সে মালাটা কালের গতিতে শুকনো হয়ে তার গলায় শোভা পাচ্ছে; কিন্তু তার সৌন্দর্যটুকুকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। তাই সৌন্দর্য রস-পিপাসু চিত্তে আনন্দ ধারা বহন করবার জন্য তার কোন কার্পণ্য নেই।

সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে এলুম। বন্ধুবান্ধবেরা প্রকাশ করলেন, মহীশূরে বৃন্দাবনে যে আধুনিক উদ্যান রচনা করা হয়েছে সেটা এরই আদর্শের অনুকরণে। শুধু মাত্র তফাত আলোর খেলায়।

মনে হল, মহীশূরের নবনির্মিত উদ্যান যতই আলোর খেলায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক না কেন, এ পরিবেশ এখানকার নিজস্ব।

তফাত শুধু—মহীশূরের উদ্যান সজীব আর এটা নির্জীব। সেটাতে চলেছে ফোয়ারার জলধারায় কৃত্রিম আলোর সাতরঙা খেলা, আর এখানে সে উৎস শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু কৃত্রিম আলোর ঝলসানি না থাকলেও প্রভাতী সূর্যের রঙীন আলো পাহাড়ের বুক বেয়ে এখনও এসে পড়ছে এই উদ্যানের গায়ে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোর রূপালী ঝরণা এখনও লুটে পড়ছে এই উদ্যানে, উদ্ভাসিত করে তুলছে তাকে অপূর্ব শোভায়।

সৌন্দর্য রস-পিপাসু জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান পূর্ণিমার আলোয়-ঘেরা উদ্যানে মার্বেল পাথরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সে সৌন্দর্য উপভোগ করতেন। আলোছায়া-ঘেরা এই উদ্যান এনে দিত তাদের বিমল আনন্দ, প্রাণে সঞ্চার করত অমৃত-স্রাবী রসসিঞ্চন।

এই সুন্দর সৌন্দর্যময় শান্ত পরিবেশে দাঁড়িয়ে বিশ্ব কবির কবিতার চরণ দু'টি বার বার মনে আসতে লাগল,—

তোমার আমার মন
খেলিতেছে সারাক্ষণ
এই ছায়া আলোকের আকুল কম্পনে,
এই শীত মধ্যাহ্নের মর্মরিত বনে।"

ভাকরা নাঙ্গাল

মোটর যানে এসে পৌঁছলুম নাঙ্গালে। অম্বালা থেকে এক মাইলের উপর এই নাঙ্গাল। সরকারী অফিস থেকে ভাকরা প দর্শনের অনুমতিপত্র নিয়ে ফিল্ড হোস্টেলে উপস্থিত হলুম চা পানে আশায়।

চা পানের পর রওনা হলুম ভাকরার পথে। মধ্যাহ্ন ভোজনে আয়োজনের অনুরোধ জানানো হলো ফিল্ড হোস্টেলের কর্তৃপক্ষকে ভাকরা নাঙ্গাল থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে। স্থির হল, ভাক থেকে ফিরে এসে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নাঙ্গাল দেখা যাবে।

বাসটা কিছুটা নেমে গিয়ে আবার উঁচুপথে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। বিশাল একটা বাস, দুর্গম গিরিপথ, কাজেই সন্তর্পণে প চলতে হলো। কোথাও বা হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের দেয়াল এব পাশে, আর একপাশে হাজার ফুট নীচু খাদ। একটু অসতর্ক হলেই বিপদের সম্ভাবনা। অপরিসর রাস্তায় অতিকষ্টে বাসগুলে পরস্পরের পথ ছেড়ে দেয়। ড্রাইভার সুনিপুণ হস্তে বাস চালিয়ে পাহাড়ের শীর্ষদেশে গিয়ে থামল। আমরাও সব নেমে পড়লুম।

চারিদিকে পাহাড় উন্নত শীর্ষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কঠিন প্রস্তর কেটে রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা সার্থকতায় রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টা চলছে।

দূরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে শতদ্রুর ক্ষীণ ধারা দেখা গেল। জলরেখা কাল আকাশের গায়ে বিদ্যুতের রেখার মত শোভা পাচ্ছে। নগাধিরাজের অপূর্ব দৃশ্য। যতই দেখা যাক, চোখ ফেরাতেই ইচ্ছা করে না।

নীচে চলেছে বাঁধের কাজ। বড় বড় ক্রেন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাঁধের নির্মাণ কার্য চলছে। সমারোহ বিরাট ও ব্যাপক।

পর্বত-বেষ্টিত ক্ষীণ-কায়া শতদ্রুর নদী নীরে সিক্ত হবে পিপাসু ভারত ভূমি। তবেই ধরিত্রী হবে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। ধরিত্রীর সন্তান পাবে আহার্যের সংস্থান। তারই একটা ব্যাপক আয়োজন চলছে এখানে। এ যেন প্রকৃতি মাকে স্নেহের কঠিন বাঁধনে বেঁধে সন্তানের স্তন্যপানের প্রচেষ্টা।

দেশ গঠনের ভার যাঁদের উপর তারা বলেন, ভারতের আধুনিকতম তীর্থস্থান হবে এইসব উন্নয়নমূলক কর্মস্থান। ভাকরা নাঙ্গাল দেশের বর্তমান অবস্থায় এ হিসাবে ভারত-তীর্থস্বরূপ। ভারতকে জানতে হলে, দেশকে বড় করে তুলতে হলে, দেশের প্রত্যেক লোকেরই দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচয় থাকা আবশ্যক। চাক্ষুষ পরিচিতি মনকে উদার করে তোলে, দেশটাকেও ভাল করে চোখের সামনে তুলে ধরে। ভাকরার পার্বত্য বন্ধুর পথ বেয়ে এসে যে কাজের পরিচয় পেলুম, সেটা ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনের একটা মঙ্গলপ্রসূ ইঙ্গিত। প্রাকৃতিক পরিবেশও অনবদ্য ও মনকে স্বতঃই আকৃষ্ট করে।

অনুমতিপত্রে গাইডের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধান নিয়ে জানা গেল তিনি থাকেন নীচে। বন্ধুবর মিশ্র ও শর্মা তার সন্ধানে নীচে নেমে গেলেন। আমরা অপেক্ষমান হয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে কখনো

বা প্রাকৃতিক পরিবেশ কখন বা বিপুল শব্দায়মান যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে রইলুম। পর্বতের সানুদেশ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে কল কল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে শতদ্রুর জল বয়ে যাচ্ছে। শীর্ষদেশেও তার সুর ভেসে এসে কানে ঝঙ্কার জানাতে লাগল।

শর্মা ও মিশ্রের কোন পাত্তা নেই। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে ঘোরার পর শেষটায় বাসে চড়ে নীচে নামতে হলো। আঁকা বাঁকা দুর্গম পথ, মোটর একটু সরে গেলেই হুড় মুড় করে নেমে যাবে হাজার ফুট নীচে, হয়ত বা পথেই চুরমার হয়ে যাবে মোটর যান। কিন্তু পাহাড়ে মোটর চালান যাদের অভ্যাস, তাদের কাছে বিপদ সহসা আসে না। সুনিপুণ হস্তে এই বিপদসঙ্কুল পথেও দ্রুত গতিতে মোটর চালাতে তারা কুণ্ঠিত হয় না।

নীচে এসে অনেক সন্ধানের পর মিশ্র ও শর্মার দেখা পাওয়া গেল। গাইডের সন্ধানে তাঁরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই দ্বিপ্রহরে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না।

প্রবহমানা শতদ্রুর দিকে চেয়ে রইলুম। বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার পর তার গতি হয়েছে খরতর। আমরা অনেকটা উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আরও খানিকটা নীচে গেলে তার স্পর্শের সান্নিধ্যে আসা যায়। তবু জলস্রোতের কলোচ্ছ্বাস তীব্র ভাবেই কানে এসে পৌঁছতে লাগল। দূর থেকে বাঁধটাকে যত ছোট মনে হয়েছিল, নীচে এসে সে ভুলটা ভাঙ্গল। বাঁধের কাছে এলেই বিরাটত্ব ধরা পড়ে। পর্বত-শীর্ষে দাঁড়িয়ে চারিদিকের বিপুলায়তন পরিবেশের তুলনায় বাঁধটাকে ছোট বলেই মনে হয়। যে শতদ্রুকে দেখেছিলুম পাহাড়ের বুকে ক্ষীণ রেখার মত, কাছে এসে দেখলুম ক্ষীণ ধারা স্ফীত কায়া হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে এল দেখে সবাই নাঙ্গাল অভিমুখে রওনা হবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘকাল ভ্রমণে ক্লান্তির সঙ্গে ক্ষুধার প্রকোপও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের ব্যবস্থা নাঙ্গালে। সবাই গাইডের আশা পরিত্যাগ করে বাসে উঠে পড়লেন।

শর্মা জানালেন, সেটি হচ্ছে না। উপরটা আমরা ভাল করে দেখতে পারিনি, সুতরাং আবার যেতে হবে। বাস চালাও উপরে।

মিশ্রও সায় দিলেন তাতে। বন্ধুবান্ধবেরাও জানালেন, দেখে এলে তো একবার। আবার উঠে কি হবে? অনর্থক দেরী হবে। এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় নাড়ীভুড়ি পর্যন্ত—

কিন্তু উভয়েই জিদ্ ছাড়লেন না। বন্ধুবান্ধবেরা এতে উষ্মা প্রকাশ করতে লাগলেন। ক্ষুধায় সবাই পীড়িত হয়েছেন। সময়ও খুব কম। অনেক স্থান দেখতে হবে। কাজেই সময়ের অপব্যবহার করা চলে না।

মাঝামাঝি রফা হলো, বাস উঠেই ফিরে আসবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে না।

আবার পাহাড়ের গা বেয়ে বাস উঠতে লাগল। শীর্ষদেশে উঠে আবার চারিদিক প্রাণ ভরে চেয়ে রইলুম। আশেপাশের চারিদিকের ঢেউ খেলানো পাহাড়গুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দূর দিগন্তের পাহাড়ের কালো রেখার সঙ্গে মিশে গেছে, এর যেন শেষ নেই। অপূর্ব, অদ্ভুত প্রকৃতির সৌন্দর্যের অবদান।

সৌন্দর্যের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে। গ্রহণোন্মুখ মনে সে উজাড় করে তার আনন্দ ধারা বরিষণ করে। অনুভূতি সে আনন্দের ধারক। মন খুঁজে খুঁজে বেড়ায় কোথায় সে আনন্দের সাড়া পাবে। সৌন্দর্য এনে দেয় সেই খোঁজার সার্থকতার পথ।

সৌন্দর্যের মঙ্গল-চিহ্ন তাই মানুষেরর মনকে দোদুল দোলায় নাচিয়ে তোলে।

ফিরে এলুম নাঙ্গালে। আহারান্তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে নাঙ্গালের বাঁধে গিয়ে হাজির হলুম।

নাঙ্গালের বাঁধ-নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে। বিরাট ও বিপুল এ বাঁধ। নদীতে বাঁধ দিয়ে, খাল করে সেচনের জল নেওয়া হচ্ছে। খাল ও নদী দুইয়ের উপর দিয়ে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এর উপর দিয়ে মানুষ ও গাড়ী-ঘোড়া চলে।

নীচে খাল বেয়ে চলেছে প্রবল জলস্রোত। জলপ্রপাত ও তার তলদেশ থেকে উত্থিত জলকণা ফেনময় পরিবেশ মনটাকে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপ্লুত রাখে। বাঁধের উপর দিয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে প্রবল বেগে পতনশীল জল ধারার দিকে চেয়ে রইলুম। বার বার দেখেও যেন দেখা শেষ হয় না।

প্রকৃতি ও মানুষ। এরা দু'জনাই মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রকৃতি মানুষের কল্যাণে অকাতরে অজস্র স্নেহ ঢেলে দিচ্ছেন। মানুষ গ্রহণের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যেখানে মানুষ তার কার্পণ্যের পরিচয় পেয়েছে, সেখানেই তার সবটুকু নিংড়ে নেবার প্রয়াসে ব্যাকুল হয়েছে। তাই গড়ে উঠেছে বড় বড় ইমারত, কারখানা, রেল, জাহাজ, এরোপ্লেন আরও কত কি! গড়ে উঠেছে কত কল্যাণ-মূলক কর্মধারা। ভাকরা নাঙ্গাল এরই একটা প্রতীক মাত্র।

নাঙ্গালে শতদ্রু নদীর তলদেশ দিয়ে নদী অতিক্রম করবার একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে। সব সময়ে সেটা খোলা থাকে না। সহসা খোলা থাকার সংবাদ পেয়ে সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে ছুটে চললেন সুড়ঙ্গ পথ পরিভ্রমণে। আমিও তাদের সঙ্গী হলুম।

ছোট বেলায় টেমস নদীর সুড়ঙ্গ-পথ সম্বন্ধে কবিতায় পড়েছি,

"উপরে জাহাজ চলে, নীচে চলে নর,
অপরূপ আছে আর কিবা এর পর।"

অবাক হতুম তখন এই কবিতা পঠনে। আজ তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখলুম এই নাঙ্গালে। টেমস নদীর সুড়ঙ্গ পথটি বিশাল ও ব্যাপক। কিন্তু এ সুড়ঙ্গ পথটি শুধু মানুষের পায়ে চলার। তাও চলতে হয় সন্তর্পণে। সেতু পরিদর্শনের ব্যবস্থার জন্য এই সুড়ঙ্গ পথ। উপরে শতদ্রুর স্রোত ভেসে চলেছে, তার অনেক নীচে সুড়ঙ্গের এই সঙ্কীর্ণ পথে মানুষের চলার পথ। অবশ্য নদী অতিক্রম করার পথ এটা নয়। তার জন্য ব্যবস্থা আছে বাঁধের উপর গঠিত সেতুটিতে।

অনেকগুলো সিড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গে নেমে গেলুম। যেন পাতাল পথ যাত্রী। নামছি তো নামছিই। অনেকটা নেমে এসে সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছানো গেল।

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোর লালচে আভা পথের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। সামনে ও পিছনে লোক। সবাই কিউ করে চলেছে। কোথাও থামবার উপায় নেই।

আশেপাশে চেয়ে দেখি সুড়ঙ্গ পথের কংক্রীট ভেদ করে কোথও ক্ষীণভাবে জল চুইয়ে পড়ছে। আবছা অন্ধকার আর স্যাঁৎসেতে পরিবেশ। সন্তর্পণে না চললে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। মনে হল, ক্রমশঃ পাতালের পথেই এগোতে চলেছি। পথ আর ফুরোতে চায় না।

অনেকক্ষণ চলার পর সুড়ঙ্গ-পথ শেষ হয়ে এল। এবার উঠবার

পালা। আসবার সময় সহজে নীচে নেমে এসেছি, তাছাড়া সিঁড়িটাও ছিল ঢালু; নামবার অথবা উঠবার পক্ষে অনুকূল। কিন্তু নদীর এপারে এসে পেলুম খাড়া সিঁড়ি। এ সিঁড়িটা গোল হয়ে এঁকে বেঁকে সোজা উপরে উঠে গেছে। উঠ্‌তে হল সন্তর্পণে। কিছুটা উঠার পর মনে হলো, দম বুঝি ফুরিয়ে যায়, আর উঠা চলবে না। কিন্তু অপেক্ষা করা চলে না। পিছনে অসংখ্য লোক আসছে। ওদের সঙ্গে তাল রেখে এগোতে হবে। কাজেই সাহস সঞ্চয় করে আবার উঠতে লাগলুম।

উপরে উঠে দম নিয়ে বাঁচলুম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। সারাদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তি এবং আহারের পর বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নেবার অবকাশ পাই নি। তারপর সহসা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে বড়ই ক্লান্তি অনুভব করলুম।

কিন্তু পরিবেশের একটা সহজাত গুণ আছে। ক্লান্তি অপনোদনে তার ত্রুটির লেশ নেই। অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্লান্তি দূর হলো। বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই হৈ হৈ করে বাসে উঠে বসলেন।

আনন্দপুর গুরুদ্বার ও গাঙ্গুয়াল

এবার যাত্রা স্থরু হল ফিরতি পথে। মোটর যান ছুটে চলল গাঙ্গুয়ালের দিকে। গাঙ্গুয়াল এসে পৌছলুম সন্ধ্যার খানিকটা আগে। সন্ধ্যার আকাশ তখন রঙীন হয়ে উঠেছে। আকাশের রক্তিমাভা বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল প্রবহমান জলস্রোতের উপর।

গাঙ্গুয়াল বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা। খালের জল নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা এখানে আছে।

পরিদর্শনের অনুমতি পাওয়া গেল। আমরা সবাই কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিপুল সমারোহ। গাইড বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। আমরা ইতস্ততঃ ঘুরে যন্ত্রের কাজ নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। উন্নয়ন পরিকল্পনার এটা বিশিষ্ট অঙ্গ। এখান থেকে চণ্ডীগড় সহর পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

গাঙ্গুয়াল থেকে রওনা হলুম সন্ধ্যার পরে। মোটর যান তীব্র-বেগে ছুটে চলল। কিছুক্ষণ পরে এসে পড়লুম আনন্দপুর গুরুদ্বারে।

শিখদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান এই গুরুদ্বার। শিখ ধর্মপ্রবর্তক মহাত্মা নানকের শিষ্যদের বলা হয় শিখ। প্রকৃতপক্ষে শিষ্য কথাটার অপভ্রংশই হচ্ছে শিখ। শিখদের প্রধান তীর্থগুলির তৃতীয় স্থান

অধিকার করেছে এই আনন্দপুর গুরুদ্বার। প্রধান তীর্থস্থান অমৃতসরে সেখানে শিখদের স্বর্ণমন্দির গুরুদ্বার স্থাপিত।

শিখদের নবম গুরু শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং এইখানেই শিষ্যদে রণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এই গুরুদ্বার দর্শনে তাই বিশ্বকবি চির পরিচিত কবিতাটির কথা মনে পড়ে গেল,—"পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ নির্মম নির্ভীক।"

মোগল রাজত্ব তখন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সমুজ্জ্বল বারম্বার শিখদের সঙ্গে লাগল মোগল বাদশাহের বিরোধ। মোগল শক্তি তখন ভারতের অধিকাংশ জুড়ে বসে রয়েছে। বিপুল এর শক্তি, অসংখ্য এর সৈন্যদল। শিখ ও হিন্দুদের উপর উৎপীড়নও কম নয়। শিখ দিল বাধা। মুষ্টিমেয় শিখ সৈন্য বার বার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। অত্যাচারেরও সীমা রইল না। ধর্মের জন্য শির দিতে তারা কুণ্ঠিত হল না, তবু চলল অত্যাচার। বিশ্ব-কবির ভাষায় বলতে হয়,—'বান্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক, সাড়াশী করিয়া দগ্ধ, সভা হল নিঃস্তব্ধ।

শিখদের নবম গুরু স্থির করলেন, এই প্রবল শক্তির প্রতিরোধ করতে হলে শিখদের বীর্য-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। সমস্ত শিখ জাতিকে একত্র করে তিনি এক দুর্বার অজেয় শিখ শক্তি গড়ে তুললেন। সঙ্কল্প সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শিখেরা রাখলেন, দীর্ঘ কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু। মাথায় নিলেন পাগড়ী, হাতে নিলেন কৃপাণ; পণ হ জীবন আহুতি। এমনিভাবেই গড়ে উঠল দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্য। অমি বিক্রমে শিখশক্তি মোগল শক্তিকে বাধা দিতে লাগল। বিপুল মোগ শক্তি এই সব মন্ত্রে দীক্ষিত শিখ শক্তির কাছে ম্লান হয়ে দেখা দিল।

এই সেই গুরুদ্বার। শিখদের রণ-মন্ত্রের দীক্ষা দাতা নবম গুরুর প্রিয় স্থান। রক্তের মোক্ষণে হয় সে দীক্ষার আয়োজন। শিখদের প্রতি রক্ত কণায় সে দীক্ষা মন্ত্র উদ্দীপনা জাগায়; অন্তরে সেটা হয় গাঁথা। নবম গুরু জানালেন অভয়ের বাণী। শিখেরা অদম্য উৎসাহে, বিপুল উদ্দীপনায়, বিশাল শক্তির উদ্বোধনে জেগে উঠল। বিশ্বকবির ভাষায় তাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে,—"অলখ নিরঞ্জন, করে ভয় ভঞ্জন।"

আজও শিখদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রু-বহুল, মাথায় বেণী ও পাগড়ী। যে প্রথা তাঁরা গুরুর কাছে পেয়েছিলেন, সশ্রদ্ধভাবে আজও সেটা মেনে চলেন।

আনন্দপুর গুরুদ্বারটি মনোরম স্থানে স্থাপিত। ছোট একটা টিলার উপরে সুন্দর এই গুরুদ্বার। রাস্তা বেয়ে গিয়ে খানিক পথ উঁচুতে উঠতে হয়। আমরা যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানালেন এখন গুরুদ্বারে কাজ চল্‌ছে, একটু অপেক্ষা করতে হবে।

একটা নোটিশ দেখলুম। গুরুদ্বারে প্রবেশ কালীন মস্তকে আবরণ ও নগ্নপদ হওয়া আবশ্যক। এ ছাড়া, সঙ্গে তামাকজাত অথবা অন্য কিছু মাদক দ্রব্য নিয়ে ঢোকা নিষেধ।

আমরা তৈরি হয়ে নিলুম। হাত পা ধোবার জন্য চৌবাচ্চায় জল ছিল, জুতো মোজা খুলে তাতে হাত পা ধুয়ে নিলুম। শীত থেকে রক্ষা পাবাব জন্য একটা গরম টুপি ছিল, সেইটা মাথায় জড়িয়ে নিলুম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডক্টর হোমার কেমফার ও তাঁর কন্যা মিস কেমফার। ডক্টর কেমফার শিক্ষাবিদ্ ও আমেরিকাবাসী। সম্প্রতি ভারতে অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত আছেন। দেখলুম এরা দু'জনে পা ধুয়ে মাথায় রুমাল জড়িয়ে আমাদের সঙ্গে গুরুদ্বার দর্শনে রওনা হলেন।

মন্দিরে তখন উদাত্ত স্বরে গ্রন্থ সাহেব পাঠ হচ্ছিল। পুরুষ ও নারীদের ছিল পৃথক আসন। সকলেই অভিনিবেশ সহকারে পাঠ শ্রবণ করছিলেন। মাঝে মাঝে দামামা বেজে উঠছিল। আমরা সশ্রদ্ধে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

বেদীর উপরে বসে শিখগুরু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। গৃহমধ্যে নবম গুরু শ্রীগুরু গোবিন্দ সিংএর ব্যবহৃত অস্ত্রাদি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে রাখা হয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একটা সুমধুর প্রশান্তি বিরাজ করছে।

কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে সকলের সঙ্গে গুরুদ্বার প্রদক্ষিণ করলুম। কর্তৃপক্ষের একজন ইংরাজী ভাষায় নবম গুরুর বাণী, শিষ্যদের পরীক্ষা, রণ মন্ত্রে দীক্ষা, গুরুদ্বার স্থাপনার ইতিহাস ও শিখ সৈন্যদের বিভিন্ন রণাঙ্গণে কৃতিত্বের পরিচয় আমাদের জানিয়ে দিলেন। এর পর আমরা আবার তাঁর সঙ্গে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলুম। তখন গ্রন্থ সাহেবের পঠন সমাপন হয়েছে। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থসাহেব গ্রন্থটি মস্তকে ধারণ করে শিখগুরু গুরুদ্বার প্রদাক্ষণ করলেন! সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও নারী শিখগণ সঙ্গীত সহকারে মন্দির প্রদক্ষিণ করে এলেন। গুরুদ্বারে একটি সুসজ্জিত পবিত্র কক্ষে গ্রন্থসাহেব অত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হলো।

সমস্ত বিষয়টাই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হলো। আমাদের কলের উপরেই তার বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হলো।

কর্তৃপক্ষ নবম গুরুর ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রাদি দেখালেন। তাঁর ব্যবহৃত াঁচটি অস্ত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখা হয়েছে। কৃপাণ, বর্শা, কিরীচ, লোয়ার ও নাগিনী—এই পাঁচটি অস্ত্র তিনি ব্যবহার করতেন। অস্ত্র- ়লি বেশ বড়। খুব শক্তিশালী ও বীর্যবান লোকের পক্ষেই তার ্যবহার সম্ভব। নবম শিখগুরু অন্তরে ও বাহিরে বিশেষ শক্তিমান ়লেন। নাগিনী অস্ত্রটি অনেকটা বর্শার মতই। সাপের মত বাঁকানো। স্তী নিধনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় অস্ত্র। এই সমস্ত অস্ত্রই শিখ াতির শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রতীক।

শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই ফিরে এলুম। নীচু থেকে গুরুদ্বারের গম্বুজটি ়খতে বেশ ভাল লাগল।

ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। রাত সাড়ে দশটায় ম্বালায় ট্রেন ধরতে হবে।

চণ্ডীগড়ে এসে সহরের প্রান্তে মোটর থামল। ছোট একটা চায়ের াকান তখনও খোলা ছিল। সবাই চায়ের আশায় ছুটে গেলেন। াইভার তাড়া দিতে লাগল। এখনই রওনা না হলে গাড়ি ধরবার আশা ম। কোন মতে এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করে মোটরে চাপলুম। াটর চলতে লাগল পূর্ণবেগে। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত চণ্ডীগড় সহর াখের সামনে থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। পাহাড়ের দিকে াকালুম। সব যেন অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে।

অম্বালায় এসে পৌঁছলুম দশটায়। তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র নামানো

হল। টিকিট কিনে যাত্রার জন্য প্লাটফর্মে দাঁড়ালুম। গাড়ির সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু গাড়ি এল না। আড়াই ঘণ্টা লেট।

একটু পরেই এল একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। মন্থর গতিতে ঘুরো পথে দিল্লীতে যাবে। সবাই ঠিক করলেন, এই গাড়ীতেই যাওয়া যাক। রাতটা ঘুমানো যাবে। গাড়ি তখন ছাড়ে ছাড়ে। সবাই ছুটোপাটি করে উঠে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হুইসিল দিয়ে গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

মথুরা ও বৃন্দাবন

অনেক দিন ধরেই মথুরা বৃন্দাবন আগ্রা প্রভৃতি দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। পূর্নিমা এসে পড়ায় কথাটা বন্ধুবান্ধবদের কাছে প্রকাশ করলুম। চারজন সঙ্গী এ পথযাত্রী হলেন। অন্ধ্র প্রদেশের বাপাইয়া রামা রাও ও রাঘবেন্দ্র রাও আর মধ্য প্রদেশের মিশ্র। যাত্রীদলের মধ্যে মিশ্র ছিল বয়ঃ কনিষ্ঠ। আমরা সবাই মিলে তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে খরচপত্রের টাকা তার কাছে জমা দিলুম। নির্দিষ্ট দিনে ওকলা স্টেশনে এসে মথুরার টিকিট কিনে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে বসলুম। গাড়ীটা স্টেশনে খুব অল্প সময়ের জন্য থামে। ভিড়টাও ছিল বেশী। টিকিট ছিল তৃতীয় শ্রেণীর তাছাড়া প্লাটফর্ম ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় লাইনে এসে উঠতে হয়েছিল। কাজেই উঠতে অনেকটা বেগ পেতে হয়েছিল।

স্টেশনে আসাটার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। টাঙ্গা আনতে বলা হয়েছিল, কিন্তু মানুষবাহী টাঙ্গার পরিবর্তে মালবাহী টাঙ্গা এসে উপস্থিত হয়। অগত্যা তারই মধ্যে বিছানাপত্র তুলে নিয়ে তার উপর বসে স্টেশনে যেতে হল। টাঙ্গাটাও এসে থামল স্টেশনের উল্টোদিকে, লাইনে দাঁড়ান ছিল কতকগুলো খালি মালগাড়ী। লটবহরশুদ্ধ প্লাটফর্মে এসে পৌছুতে হল ঐ মালগাড়ীর নীচু দিয়ে হামাগুড়ির সাহায্যে।

মিশ্র হেসে বললে আমরা পঞ্চ পাণ্ডব চলেছি মথুরায়। দলের মধ্যে আমিই ছিলুম বয়োঃজ্যেষ্ঠ, তাই আমার দিকে তাকিয়ে বললে সে, আপনি তো যুধিষ্ঠির—হাসলুম তার এই উক্তিতে।

দিল্লি থেকে মথুরার দূরত্ব প্রায় আশী মাইল। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গেলে ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। ট্রেনে এক মথুরাবাসী মহিলার সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি বৃন্দাবন যাবার ও দর্শন ব্যবস্থার অসুবিধার কথা জানালেন।

মথুরা স্টেশনে গাড়ী এসে পৌঁছাল বৈকালে। বৃন্দাবন যাবার টাঙ্গা ঠিক করে সমস্যায় পড়া গেল, বিছানাপত্র কোথায় রাখা যায়? সবারই ইচ্ছা বৃন্দাবন দর্শন করে রাতেই ফিরে আসতে হবে মথুরায়।

ভদ্রমহিলা রিক্সায় বসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি জানালেন, বিছানাপত্রগুলো কয়েক ঘন্টার জন্য তার বাসাতেও রাখা চলতে পারে। সবাই মিলে টাঙ্গায় চড়ে তার বাসার দিকে অগ্রসর হলুম। ভ্রমণটাও ছিল অদ্ভুত। জিনিসপত্রেই টাঙ্গাটা বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। তারপর মানুষ বসে কোথায়? আমারা সংখ্যায় পাঁচজন, অথচ মিশ্রও দুটো টাঙ্গা ভাড়া করবে না। নেতার কথা অমান্য সম্ভব হবে না ভেবে

অগত্যা ঐ একটা টাঙ্গাতেই মানুষের উপর মানুষ বসে স্থান করে নিতে হল। আমার পা দুটো এ ব্যবস্থার ফলে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

খানিকটা পথ গিয়েই মিশ্র মত পরিবর্তন করল। বৃন্দাবন থেকে কখন ফেরা যাবে, আদৌ ফেরা যাবে কিনা তার স্থিরতা নেই। শীতের দিন, বিছানা ছাড়াও চলবে না। সুতরাং এ অবস্থায় বিছানাপত্র সঙ্গে রাখাই সঙ্গত। ভদ্রমহিলাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে টাঙ্গার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার বৃন্দাবন পথযাত্রী হওয়া গেল। টাঙ্গা চলতে লাগল মন্থর গতিতে। আমার পা দুটো যথাপূর্ব ঝুলতেই লাগল। গাড়োয়ানের কষাঘাতে ঘোড়া মাঝে মাঝে পেছনের পাদুটো তুলে প্রত্যাঘাতের প্রচেষ্টা করছিল। অতি সন্তর্পণে সে আঘাত থেকে পা দুটোকে বাঁচাবার প্রয়াস করতে লাগলুম।

মথুরা স্টেশন থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব সাত মাইল। পিচ রাস্তা। অনবরতঃ টাঙ্গা চলছে। বাস সার্ভিস ও আছে। টাঙ্গা যাত্রীর সংখ্যা সব সময়ে চারজনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। একটা টাঙ্গায় দেখলুম সংখ্যা ডবলেরও বেশী। ভাবলুম মিশ্রের এ ব্যবস্থা চলার পথে অনুকুল না হলেও স্থানীয় প্রথাসম্মত।

পথে পড়ল বিড়লার বিষ্ণু মন্দির। সুদৃশ্য লাল রঙের বড় মন্দির। পিচের রাস্তার ধারেই এ মন্দির।

বৃন্দাবনে পৌছুলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। এখানে প্রায় ঘরে ঘরেই মন্দির। সামনেই পড়ল মোগল সেনাপতি মানসিংহের বিষ্ণু মন্দির। লাল পাথরের তৈরী বিরাট মন্দির। মন্দিরের সুক্ষ্ম কার্য দেখবার জিনিস। সমতল ভূমি থেকে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের দ্বারে পৌছতে হয়। মন্দিরের সামনে বড় চত্বর। এত কালের পুরানো হলেও মন্দিরের পাথরের কাজ অটুট রয়েছে। যত্নাভাবে ইতস্ততঃ

মলিন হয়ে আছে বটে, কিন্তু একটু যত্ন পেলেই মন্দিরটি আবার ঝক্ ঝকে তক তকে হয়ে উঠবে।

হাত পা ধুয়ে নিয়ে মন্দিরে উঠলুম। উঠানে ফুলের মালা বিক্রী হচ্ছিল। চার পয়সা দিয়ে ছোট ছুটী গাঁদা ফুল আর দুটো সাদা ফুলের মালা কিনলুম। বন্ধু চতুষ্টয়ও মালা কিনে নিলেন। মালাগুলি পুরোহিতের হাতে দিয়ে দেবদর্শন ও চরণামৃত গ্রহণ করে মন্দির থেকে ফিরে এলুম। লাল পাথরের এই বিরাট মন্দির দর্শকের দৃষ্টি উচ্ছসিত করে তোলে।

সামনে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির অনুকরণে শ্রীরঙ্গনাথজীর বিরাট মন্দির। পাণ্ডাজী প্রকাশ করলেম, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে। সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে। আরতির পরেই মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হবে।

সামনের গেট বন্ধ। কাজেই পাণ্ডাজীর সঙ্গে পিছনের গেটের দিকে চললুম। বিরাট মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। মন্দিরের এক পাশ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে গেটের সন্ধান পেলুম। গেট অতিক্রম করতেই দৃষ্টি পথে পড়ল বিরাট এক ধ্বজ স্তম্ভ। পাণ্ডাজী প্রকাশ করলেন এটী সোনার পাতে মোড়া। রাতে ও তা থেকে স্বর্ণের উজ্জ্বলতা দীপ্তি পাচ্ছিল।

মন্দিরটীর প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ অনেক বেশী, কাজেই মন্দির দেউলে অনেকটা এগিয়ে যেতে হল। দুজন সেবক দুটী চামর নিয়ে মন্দির দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। সুমধুর সুরে আরতির বাদ্য বাজতে লাগল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করতে লাগলুম। মনের ভিতরে আনন্দের অনুভূতি সাড়া জাগাতে লাগল। আরতির ধূপাগ্নি নিয়ে পুরোহিত এগিয়ে এলেন। সবাই সেই অগ্নি স্পর্শ করে মাথায় হাত রাখল। আমরাও অগ্নি স্পর্শ করে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলুম।

মিশ্র বললে, রাত হয়েছে, এখন মথুরায় ফেরা দরকার। সেখানে আবার ঠাকুর দর্শন করতে হবে।

বৃন্দাবনে অনেক কিছু দেখবার ছিল। মন্দিরের অন্ত নেই এখানে। তাছাড়া ঠাকুর অন্তরের জিনিষ। অন্তর দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করতে হয়। সেজন্য সময় প্রয়োজন। কিন্তু সে সময়ই বা কই ?

অথচ যে সময়টুকুই পেয়েছিলুম জীবনে সেটী অক্ষয় সম্পত্তিই হয়ে রইল। মানুষের জীবনে সময় ও সুযোগ আসে খুব কম ; কিন্তু যেটুকু আসে সেটুকুও যদি অনুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। তাহলে অন্তরে যে প্রেরণার উদ্বোধন হয়, সেটুকুর দামও তো কম নয়।

শ্রীভগবান বলেছিলেন, বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদ মেকম্ ন গচ্ছামি। এই সেই বৃন্দাবন। এখানেই ভগবান নরদেহ ধারণ করে লীলা বৈচিত্র্যে ভরপুর হয়েছিলেন। এই ত তার সেই লীলাভূমি। আজও যমুনার জল কল-কল সুরে বৃন্দাবনের স্পর্শ নিয়ে যায়। আজ আর ঠাকুরের নরদেহ নেই, সে লীলাখেলাও প্রাচীন অবদানের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠাকুরতো বিশ্বময় ব্যাপক। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছেন কোটী কোটী লোকের অন্তরে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে সারা ভারতের লোক উদ্বেল হয়ে উঠে। তাইতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করতে পারেন না, ভক্তের অন্তরে তাঁর স্থান, সেইটাই তার চির বৃন্দাবন। সেখানেই তিনি চির বিরাজমান।

লীলা বৈচিত্র্যে ভরপুর এই শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবন। দর্শন মাত্রেই মন উল্লাসে অধীর হয়, ভেসে আসে ভগবানের অপরূপ রূপ। মনের কোঠায় বার বার টেনে এনেও যেন আশ মেটে না। কবির ভাষায় মনে হয়,

জনম জনম হাম ও রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল,

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

তাইত! হৃদয় জুড়াবে কেন? বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য যেখানে কেন্দ্রীভূত, আনন্দের যা মূলাধার, সেখান থেকে চোখ ফেরান যায় কি করে। ভগবান ভক্তের হৃদয় কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেন। কঠিন এ পরীক্ষা।

টাঙ্গার পাশে এসে পড়লুম। অনেকটা যেন নিজের অজানাতেই মনটা উধাও হয়ে গেল সেই সুদূর যুগে। বংশীবদন লীলাবৈচিত্র্যে বিভোর হয়ে আছেন। বাঁশীর সুর হৃদয়ে অনির্বচনীয় আনন্দের আভাস জানাচ্ছে। গোপীগণের চিত্ত অধীর। চারিদিকে আনন্দের ছবি, সচ্চিদানন্দের মূর্ত বিকাশ। মন থেকে স্বতঃই উৎসারিত হল, তাই প্রণাম মন্ত্র—

ওঁ গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্চিত তনুং গো গোপ

সংমাবৃরতং গোবিন্দং কলবেনুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।

চমক ভাঙ্গল মিশ্রের কথায়। পাণ্ডাজীর সঙ্গে তার বচসা লেগে গেছে। মিশ্র তাকে আট আনা দিয়ে বিদায় করতে চাচ্ছে, পাণ্ডাজীর তাতে ঘোর আপত্তি। দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছেন আট আনায় কি সংসার চলে। মিশ্রও তার সংসার চলার ভার নিতে কুণ্ঠিত। আমাদের অনুরোধ. অগত্যা মিশ্র এক টাকায় তার সঙ্গে রফা করল।

বৃন্দাবন সহরটি ছোট হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বহু বাঙ্গালীর বাস আছে এখানে। অধীবাসিদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই

বেশী। অনেক গোশালা ও গোচারণ ক্ষেত্রও দেখলুম। গোচারণ ভূমি রুক্ষ ও অনুর্বর বলেই মনে হল।

পথে যেতে দেখা গেল প্রেম মহাবিদ্যালয়। একটা ইনজিনিয়ারিং কলেজ। বৃন্দাবন সহরে ঢোকার মুখেই বড় একটা বাঙ্গালীর দেওয়া ধর্মশালা রয়েছে।

শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের কাছে ছোট একটা দোকান আছে। সেখান থেকে কিছু মুড়ি কেনা গেল। সবাই চায়ের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কাজেই চা পানের ব্যবস্থাও হল।

আবার সবাই টাঙ্গায় চড়ে মথুরার দিকে ফিরে চললুম। বসবার জায়গা পরিবর্ত্তনের সুযোগ মিলল না। সুতরাং পূর্ব্বের মত পাদুটো শূন্যেই দোদুল্যমান রইল। আমার অবস্থাও হল ত্রিশঙ্কুর মত। গোদের উপর বিষ ফোঁড়া। এর পরও কখন বা টাঙ্গাচালক কখনো বা মিশ্র তাদের দেহভার আমার উপর এলিয়ে দিতে লাগল। দুটো সামলিয়ে নেবার প্রচেষ্টাতেই অনেকটা সময় কেটে গেল; আমরাও এসে পৌঁছুলুম মথুরায়। রাত তখন নটা।

মথুরার বড় মন্দিরে দ্বারকানাথ বিগ্রহ স্থাপিত। আমাদের টাঙ্গা এসে থামল মন্দিরের দ্বারে। দেখলুম, দ্বার রুদ্ধ, রাতে আর খোলার সম্ভাবনা নেই।

বাপাইয়া বললে, এখানে অপেক্ষা না করে রাতেই আগরা চলে যাওয়া যাক।

অনেকে সায় দিলেন তাতে কিন্তু মিশ্র ও রামা রাও তাতে রাজী হলেন না। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থানেই কলিকাতাওয়ালার ধর্মশালা পাওয়া গেল। মিত্র কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে একটা ঘরের বন্দোবস্ত করে ফেলল। জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে সেখানে উঠলুম।

দোতালায় একটা ছোট ঘর। উপরে পায়খানা আর জলের কলের ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা মোটের উপর মন্দ নয়। সোৎসাহে মেঝের উপর নিজেদের বিছানা পেতে নিলুম।

খাবার ছিল সঙ্গে পুরী ও তরকারী। মিশ্র দোকান থেকে পেড়া সন্দেশ আদি নিয়ে এল। পরিতোষ সহকারে আহার সমাপ্ত করে ঘুমিয়ে পড়লুম।

মিশ্রের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল রাত চারটায়। নিজ নিজ বিছানা বাঁধবার নির্দেশ দিয়ে সেই প্রবল শীতের মধ্যেই রামা রাওকে সঙ্গে নিয়ে সে যমুনায় স্নান করতে চলে গেল। বলে গেল, এইমাত্র ফিরে আস্‌ছি, এসেই চলে যাবার ব্যবস্থা হবে।

আমরা শীতে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। শীতটা দিল্লীর চেয়ে কম হলেও প্রচণ্ডতা উপেক্ষার বিষয় নয়।

প্রাতকৃত্য সেরে বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে মিশ্রের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু তার কোন পাত্তা নেই। দেখতে দেখতে বেশ বেলা হয়ে গেল, তবুও মিশ্রের টিকিও দেখা গেল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার ফলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম আমরা।

বাপাইয়া বললে, শেষটায় যমুনার কচ্ছপে ধরল নাকি ওদের? হাসলুম একবার। ভাবছি, সন্ধান নেবার জন্য একবার বেরিয়ে পড়ব কিনা, এমনি সময় রামারাওএর সঙ্গে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এসে মিশ্র জানাল, দ্বারকানাথ মন্দির বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দর্শন করতে হলে এখনই ছুটে যান। দেরী হলেই গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

এস্ত ব্যস্ত হয়ে আমরা উঠলুম। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে দেখি ভিড় তখনও কমেনি। বহুলোকের আনাগোনা সমভাবেই চলছে। তবে মন্দিরের দ্বার বন্ধ হবারও আর বেশী দেরী নেই।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মূর্তি দেখলুম। শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি। আগাগোড়া কাপড়ে ঢাকা শুধু মাত্র মুখ দেখা যায়। আর এক স্থানে যুগল মূর্তি আছে লক্ষ্মী নারায়ণের। দলে দলে লোক এসে প্রাতঃকালীন উপাসনা দেখছে। এইটাই মথুরার মধ্যে বড় মন্দির এবং বহু ভক্তের সমাগম হয় এখানে। এ ছাড়া আছে মথুরানাথের মন্দির, সেখানেও ভক্তের সমাগম কম নয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উপাসনা দেখলুম। ভিড় ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগল। এক জায়গায় দাঁড়ানো কঠিন, ক্রমশঃ স্থান পরিবর্তন করতে হল। কিছুক্ষণ পরে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলুম। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান দর্শনে যেন সবকিছু ভুলে যাওয়া যায়।

তীর্থ স্থানের একটা মহিমা আছে। দর্শনে হৃদয় যেন স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আনন্দ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনকে অভিভূত করে ফেলে। মনটা যেন তার জন্য তৈরীই থাকে।

যমুনা নিকটেই। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের সান্নিধ্যে পৌঁছুলুম। দেখলুম ভুলক্রমে মেয়েদের ঘাটে এসে পৌঁছেছি। অবশ্য মেয়েদের ঘাটে দু একজন পুরুষকেও সেই সকালে স্নানরত দেখলুম। আমি ঘাট বদলে নিলুম। কয়েকটা নৌকা ছিল ঘাটে বাঁধা। মাঝিরা এসে জিজ্ঞেস করলে, ওপারে যাব কিনা। আমি অসম্মতি জানালুম। সময় নেই। ওপারে দেখবার কি আছে জানিনে। কিন্তু ভবনদীর ওপারে যাবার সময় কখন এসে পড়বে, নিজেও সেটা টের পাব না।

যমুনার জল মাথায় দিলুম। খানিকটা গায়েও ছিটিয়ে দিলুম। ভগবানের পাদস্পর্শপূত যমুনা নদী। কালের কবলে সবই গেছে, শুধু যায়নি যমুনার জলধারা। তাই পারে বসে মনে হয় সেই সুদূরের কথা, যমুনা, এই কি তুমি সেই যমুনা?

বাপাইয়া বললে, ওঠা যাক এখন, আবার যেতে হবে আগ্রায়।

উঠে দাঁড়ালুম, মনে মনে জানালুম তোমার বড় কাছে এসে তোমায় দেখে গেলুম ঠাকুর, তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা জানিনে। জানবার স্পর্ধাও নেই। তবু ভক্তের অন্তরে তোমার বাসা, অন্তরটা ভক্তির পথেই চালিয়ো, এটুকুই আশা।

টাঙ্গা আর রিক্সায় চড়ে মথুরা সহরের খানিকটা দেখে নিয়ে বাস স্টাণ্ডে উপস্থিত হলুম। মথুরা একটা জেলা শহর। পুরানো শহর বলে আধুনিক বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই। ঘর বাড়ীর চমকপ্রদ চাকচিক্য না থাকলেও সারা ভারতের অন্তর জুড়ে রয়েছে এই মথুরা আর বৃন্দাবন।

বাস স্টাণ্ডে চা পান সমাধা করলুম। দোকানী বাসেই চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। মিশ্র আমাদের টিকিট কিনে আনল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাস রওনা হল আগ্রার পথে।

মথুরা ও বৃন্দাবন চোখের সামনে থেকে সরে গেল। দূর থেকে নতি জানালুম, যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুর গনাঃ দেবায়তস্মৈনমঃ।